এখন ডুয়ার্স

১ ডিসেম্বর ২০১৬। ১২ টাকা

শীত মানেই পরিযায়ীদের ডুয়ার্স

তিস্তা বঙ্গের মেলা-উৎসব ২য় পর্ব

উপনির্বাচন ঃ রেকর্ড মার্জিন তবু ভ্রুকুঞ্চনের কারণ কিছু ঘটল ?

নোট বাতিল ঃ উত্তরের কিস্‌সা কাহানি

চিলাপাতার গভীরে ক্যানোপি রিসর্ট

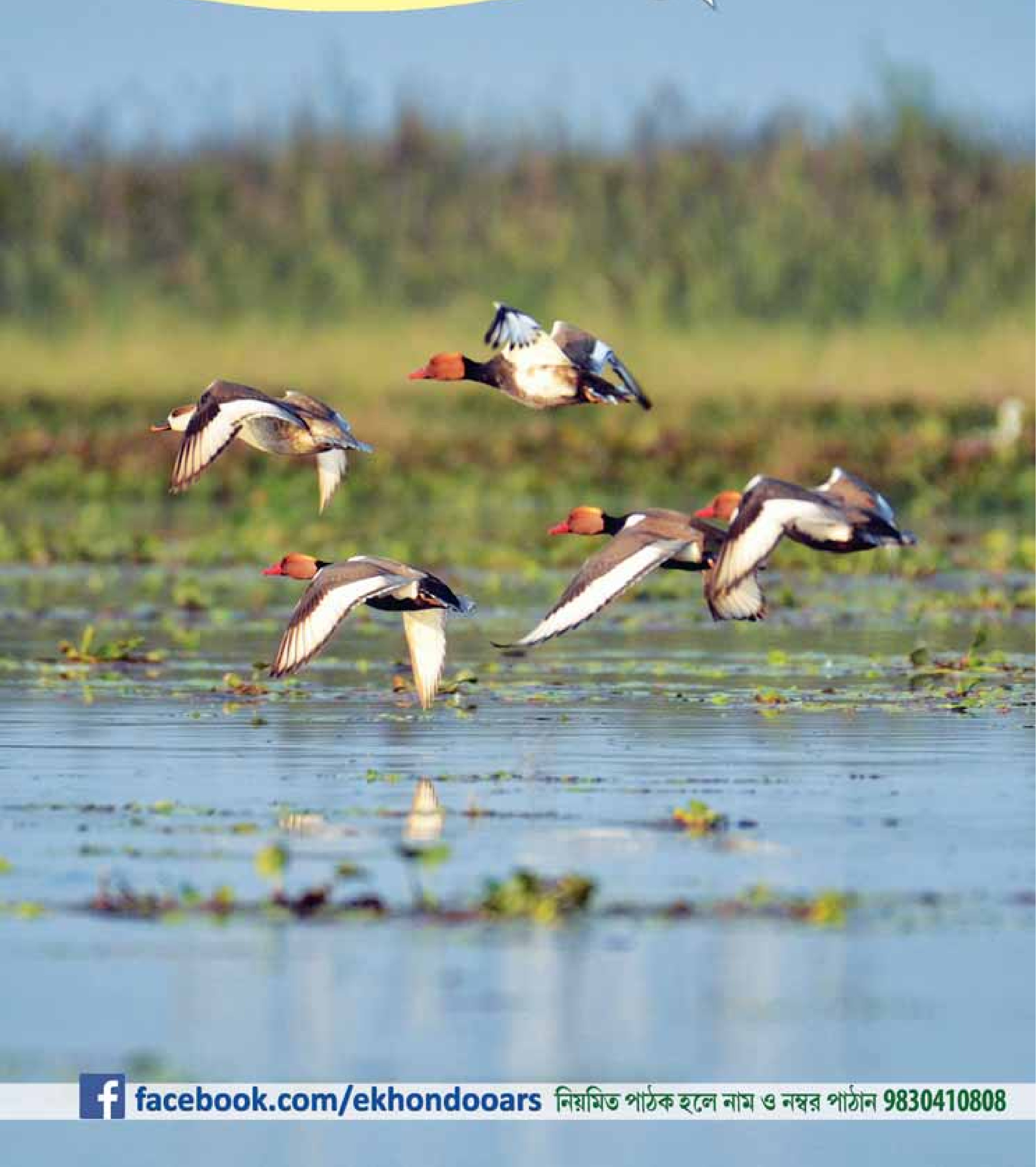

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

শীতের গন্ধ ডুয়ার্স জুড়ে
চা-বাগিচার স্বর্গপুরে
আকাশপথে ভাসিয়ে ডানা
পরিযায়ীরা আসছে উড়ে!

ডানায় তাদের হিম লেগেছে
পাহাড়চূড়া ঐ জেগেছে
বনঢাকা সব ঝিল-ঝোরাতে
দৃষ্টি এখন আটকে গিয়েছে!

পাখির ডাকে সকাল জাগে
শিশিরবিন্দু পাতায় লাগে
আবছায়াতে পথ ঢেকেছে
কোন্ অজানার অনুরাগে!

ডুয়ার্স জুড়ে শীত যে হাসে
রোদ ছোঁয়া সব সবুজ ঘাসে
জংলী ফুলের বর্ণমালায়
পাখির ঠোঁটে ছন্দ ভাসে!

ছন্দে- অমিত কুমার দে
ছবিতে- অতনু সরখেল

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা
১ ডিসেম্বর ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স
পরিযায়ী বনাম পিকনিক পার্টি ৫

বইমেলার ডুয়ার্স
'অভিনব ডুয়ার্সে' প্রকাশিত ৪

তিস্তাবঙ্গের প্রাচীন মেলাগুলি ধর্মীয় উৎসব ঘিরে হলেও এখন সার্বজনীন ৮

উত্তরপক্ষ
ডুয়ার্সের কিস্সা কাহানি ১৩

দূরবিন
কালো টাকার স্রষ্টা ডাক্তার-মোক্তার-শিক্ষক-সাধারণ মানুষও ১৬

চায়ের ডুয়ার্স
বাগানে কাজে লাগানো হচ্ছে বাংলাদেশী শস্তার শ্রমিকদের? ১৮

রেকর্ড মার্জিন তবু কিঞ্চিৎ ভ্রুকুঞ্চনের কারণ কিছু ঘটিল? ২২

শীতের ডুয়ার্স
এই শীতেই সৃষ্টি হয় দার্জিলিং! ২৯
শীতের ডুয়ার্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বই ৩১
ঝাঁপি খুলতেই শুধু পিকনিকের স্মৃতি ৩৩

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স ৩৭

স্মৃতির ডুয়ার্স ৪২

শুরু হল 'শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব' ৪৬

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬
পর্যটনের ডুয়ার্স ২৪
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪৪

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৬
তরাই উৎরাই ৩৫
লাল চন্দন নীল ছবি ৩৯

শ্রীমতী ডুয়ার্স
এবারের শ্রীমতী ৪৩
ভাবনা বাগান ৪৭

'এখন ডুয়ার্স' পুরনো সংখ্যা

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার জন্য হামেশাই আমাদের কাছে ফোন বা মেল আসে। ম্যাগাজিন স্টলে বা হকারদের কাছে কোনও পত্রিকারই পুরনো সংখ্যা পাওয়া যায় না। আমাদের পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলি অবিক্রীত কিছু কপি সযত্নে রাখা থাকে। সারা বছরের প্রকাশিত সবকটি সংখ্যা এক সঙ্গে নামমাত্র দামে আসন্ন বইমেলায় 'এখন ডুয়ার্স' স্টল থেকে বিক্রি করা হবে।
বাইরেও কেউ চাইলে ক্যুরিয়ার যোগে পাঠান যেতে পারে।
যোগাযোগ **দেবজ্যোতি কর, ৯৮৩০৪১০৮০৮**।

ডুয়ার্সের কফি হাউস এখন জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা
গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার
টিভিতে ম্যাচ দেখা
বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা
এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?

বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

facebook.com/aaddaghar

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি পৌরসভা তার এলাকার বাসিন্দাদের জন্য এমন বেশকিছু সুযোগসুবিধা এনে দিয়েছে যা পেয়ে খুশি সবাই। অনেকগুলো কাজের মধ্যে ম্যাস্টিক-রোড একটি। শহরের বড় বড় রাস্তাগুলোকে ম্যাস্টিক করা হয়েছে। যানবাহন চলাচলের সুবিধের জন্যে এই রাস্তা শহরবাসীর পক্ষে অত্যন্ত সুবিধেজনক হয়েছে। পাহাড়পুর থেকে শহরে ঢোকার পথ, ওদিকে শিলিগুড়ি থেকে এবং হলদিবাড়ি থেকে শহরে ঢোকার পথ (যতটা পৌরসভার এলাকাভুক্ত) সবটাতেই ম্যাস্টিক করার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এরকম আরও নানান পরিকল্পনা নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি। সকলের সহযোগিতা কাম্য।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

‘অভিনব ডুয়ার্সে’ প্রকাশিত

মঞ্চে পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ডুয়ার্সের বিশিষ্ট পরিবেশ কর্মী ও লেখক দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (বাঁ দিকে) ও ‘এখন ডুয়ার্স’ পত্রিকার সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা (ডান দিকে) *ছবি : রিমিক চক্রবর্তী*

২৭ নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৩৪তম উত্তরবঙ্গ বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনে ‘অভিনব ডুয়ার্সে’ বইটি প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। উল্লেখ্য, এটি ‘অভিনব ডুয়ার্সে’ বইয়ের ৫ম সংস্করণ, প্রকাশিত হল সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ও কলেবরে। বইটির ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ২০১০ সালে, প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় একই বছর প্রকাশিত হয় ২য় সংস্করণ। এবারের

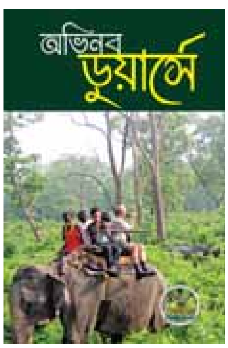

সংস্করণে গত দু’বছরে ‘এখন ডুয়ার্স’-এ প্রকাশিত ডুয়ার্স পর্যটন সংক্রান্ত রচনা ও ছবি থেকে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে। ডুয়ার্স পর্যটনের খনি হিসেবে যেমন জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ডুয়ার্স জুড়ে শুরু হয়েছে পর্যটন শিল্পে উন্নয়নের নানা কর্মসূচি। ‘এখন ডুয়ার্স’-এর পক্ষ থেকে এই বই প্রকাশ সেই কর্মসূচিতে যোগদানের নামান্তর। হার্ডবোর্ড বাঁধাই, আগাগোড়া রঙিন ছবিতে ভরা দু’শো পাতার এই বইটির দাম ২০০ টাকা। বইমেলায় ‘এখন ডুয়ার্স’-এর স্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

‘এখন ডুয়ার্স’ নিয়মিত হাতে পেতে চান?

অবশেষে ‘এখন ডুয়ার্স’ পত্রিকার পাঠকদের জন্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এবং কলকাতা শহরের যে কোনও ঠিকানায় আমাদের প্রতিনিধি নিয়মিত ‘এখন ডুয়ার্স’ পৌঁছে দিতে পারবে। ২০১৭ সালের সব ক’টি সংখ্যার জন্য এককালীন ৩০০ টাকা জমা দিলেই এই পরিষেবা দেওয়া সম্ভব। ২৭ নভেম্বর-৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ বইমেলাতে ‘এখন ডুয়ার্স’-এর স্টল থেকে এই গ্রাহক নেওয়া চালু হবে। যাঁরা নিজেদের ঠিকানায় নিয়মিত ‘এখন ডুয়ার্স’ পেতে ইচ্ছুক, যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি দপ্তরে। ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭ (বিকেল পাঁচটা থেকে রাত ন’টা পর্যন্ত)।

পরিযায়ী বনাম পিকনিক পার্টি

নরেন্দ্র মোদির ফতোয়া গজলডোবা বা রসিক বিলে ফি বছর বেড়াতে আসা পরিযায়ী পক্ষীকূলকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তবে নগদ মুদ্রার অভাব ডুয়ার্স অভিমুখী মানব পরিযায়ীদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করছে পর্যটন মহল। সে নিয়ে বিতর্ক বা আলোচনায় না গিয়ে এটুকু বলা যায়, পরিযায়ী তা সে পক্ষী বা মানব যাই হোক না কেন, দুইয়েরই শীতকালে ডুয়ার্সে ভীড় জমানোর প্রবণতা দেখা যায়। কুয়াশাঘেরা জলাশয়ে মিষ্টি রোদে উড়ে বেড়ায় পরিযায়ী পাখির ঝাঁক। ঠিক তেমনই জিপসি গাড়িতে চেপে জঙ্গলের পথে বেরিয়ে পড়ে শহুরে পর্যটকের দল। হাতে বাইনোকুলার বা ক্যামেরা নিয়ে সদলবলে হাতি বা বাইসন দর্শনের রোমাঞ্চে পুলকিত হওয়ার লোভ সামলাতে পারে কি কেউ? অনাবিল আনন্দের খোঁজে আসা সেইসব পরিযায়ীদের নিয়ে মেতে ওঠে শীতের ডুয়ার্স।

কিন্তু সত্যিই কি মেতে উঠতে পারে? জঙ্গলে, পাহাড়ের বাঁকে যেখানেই খানিক স্রোতস্বিনীর সন্ধান মেলে সেখানেই ভীড় জমায় স্থানীয় পিকনিক পার্টি। মাইক বাজিয়ে দিনভর চলে হুল্লোড়, মাংস ভাত আর মদের ফোয়ারা। করবেই না বা কেন? ডুয়ার্সের শীতের আমেজ উপভোগ করার অধিকার যে তাদেরই প্রথম। আজকাল আবার বেশিরভাগ ক্লাব বা সংগঠনের পিকনিক স্পনসর করেন স্থানীয় দাদারা। বছরভর মিটিং মিছিলে দল বেঁধে পিছনে ঘোরা আর গলাবাজি করার দরাজ বকশিস। খানা-পিনা আনলিমিটেড। স্বাভাবিকভাবে মত্ততা সেক্ষেত্রে খানিক বেশিই থাকে।

কিন্তু এতে প্রাণান্তকর অবস্থা হয় পরিযায়ীদের। বনভোজনের দাপটে শীতের দিনগুলিতে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা প্রত্যেকবারই কমে আসছে। মাইকের প্রবল আওয়াজে এসময় বন্যপ্রাণ সব ল্যাজ তুলে পালায় বনের গভীরে। জঙ্গল সাফারিতে গিয়ে তাদের দর্শন পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। নিরাশ হয়ে ফিরতে দেখা যায় শহর থেকে বাবা-মা-এর সঙ্গে বেড়াতে আসা খুদে পর্যটকদের— দূর, কিছুই দেখা গেল না, এর চাইতে চিড়িয়াখানায় গেলেই ভাল হত। এর ওপর পরিচিত পিকনিক স্পটগুলির আশপাশের কোনও ট্যুরিস্ট রিসর্টে যদি থাকার ব্যবস্থা হয় তো সে পরিযায়ীর দিনযাপন সত্যিই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

তারপরেই আসে পিকনিক-পরবর্তী বিধ্বস্ত পরিবেশের কথা— আবর্জনার স্তূপ পড়েই থাকে দিনের পর দিন, যা যে কোনও সুস্থ মানুষে আঁতকে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। খুব সামান্য কয়েকটি জায়গায় স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে পিকনিকের পর জায়গাগুলি পরিষ্কার করা হয়। সরকার যদি ডুয়ার্সের ইকো ট্যুরিজম প্রসারে সত্যিই মনোযোগী হন তবে প্রথমেই যেটা চালু করতে হবে তা হল— বনাঞ্চলে চলাফেরা করার কড়া আইন এবং শৃঙ্খলাভঙ্গে চড়া শাস্তি। পিকনিক পার্টিকে যদি সচেতন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ না করা হয় তবে আগামী শীতে পরিযায়ীর সংখ্যা যে ক্রমশ কমে আসবে সে কথা এখনই হলফ করে বলা যায়।

আন্দামান

গোয়া

কেরালা

যে কোনও দিন

ANDAMANS
Ex Port Blair. 6N 7D
Portblair Sightseeing, Cellular Jail, North Bay-Ross Island/Jolly Buoy, Havelock/ Neil island, Jarwa Reserve. Rs 16,500 Standard. CP, Non AC Vehicle & Govt Boat. Additional charges for Mayabandar-Diglipur.

GOA
Ex Dabolim Airport / Madgaon Rly. Stn. 3N 4D. Rs. 13,900 Standard. Plan CP, Pick up & drop Station/Airport, tea coffee maker, one full day sightseeing trip with river Mandovi cruise, Unlimited Swimming Pool. (Except Dec. 15 to Jan. 5)

KERALA
Ex Cochin. 7N 8D
Cochin-Munnar-Thekkady-Alleppey/Kumarakom-Kovalam Rs 26,000 for Deluxe. Plan CP; AC vehicle for transfer & sightseeing.

HOLIDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office:
Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866

খুচরো ডুয়ার্স

উড়ো সমস্যা

বলা নেই কওয়া নেই, আকাশ থেকে জওয়ান এসে পড়ল গো! দার্জিলিং জেলার চণ্ডালজাত গ্রামে এক মনে তুঁত গাছের পাতা তুলছিলেন এক রেশম চাষি। ভারী মনোরম আবহাওয়া। আচমকা তুঁত থেকে ভূত! ঝপ করে আকাশ থেকে তাঁর রেশমবাগানে এসে পড়লেন জওয়ান মুকেশ রায়। বাগান মালিক ঘেমে কেঁপে ঘেবড়ে একশেষ! কে জানে, চিন আক্রমণ করল কি না! পরে অবশ্যি জানা গেল, নিতান্তই নিরামিষ ব্যাপার। হাজারকয়েক ফিট উঁচু থেকে প্যারাশুট পরে লাফ মেরেছিলেন জওয়ানভাই। কিন্তু বাতাসের মতিগতি গোলমেলে থাকায় অদূরে সেনাঘাঁটির বদলে রেশমবাগানে অবতরণ করেছেন। যাক বাবা! বাঁচলুম!

পেইন ড্রাইভ

তিন ছাত্রীকে কিডন্যাপ করে গা-ঢাকা দেবে— এই ছিল তাদের ফন্দি। তক্কে তক্কে অপেক্ষাও করছিল শিলিগুড়ির এক জায়গায়। ছাত্রীত্রয় আসতেই ফিল্মি কায়দায় লাফিয়ে পড়েছিল। কিন্তু চিত্রনাট্যে একটা জিনিস ছিল না তাদের। পাবলিক এমন রে রে রবে ছুটে এসে উত্তম-মধ্যম দিয়ে ঘায়েল করে ফিরবে। ফলে ঘোর কেলো! পুলিশ এসে অপহরণকারীদের জনতা দ্বারা অপহৃত হতে বাঁচায় শেষে। কিন্তু গপ্প কি এখানেই ফুরাল? মোটেই না! অকুস্থলে পাওয়া গেল একখানা পেন ড্রাইভ। তার মধ্যে পাওয়া গেল পিস্তল হাতে তিন তিনজন ছোকরার ছবি। ব্যাস! পুলিশ আহ্লাদে খোঁজখবর শুরু করে দিল জোরকদমে। শেষে মাটিগাড়া থেকে পাকড়াও করা হল তিন মূর্তিমান অপরাধকুলের কলঙ্ককে! নিষিদ্ধ অস্ত্র হাতে ছুবি তুলেছিস, ভাল কথা! তা সেসব পেন ড্রাইভে রাখার কী দরকার বাপ? ফেসবুকে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল বুঝি? বোঝ এবার পেন ড্রাইভের পেইন!

এলিফ্যান্টাস্টিক

চমকডাঙ্গি গ্রামের সেই প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চারা কেন মাঝে মাঝেই স্কুলে যেতে গিয়ে অর্ধেক পথে ফিরে আসে, সে তো সবাই জানে। মাঝরাস্তায় হাতি পথ অবরোধ করে থাকলে ফিরতে তো হবেই! তা এটা না হয় মেনেই নিয়েছিল পড়ুয়ারা! তারপর ধরুন হাতিরা এসে মাঝেমধ্যেই মিডডে মিলের চাল লুঠ করে পালাত, সেটাও মেনে নিয়েছিল। কিন্তু লুঠের পরিমাণ আচমকা ভয়াবহ হয়ে ওঠায় বেচারাদের অবস্থা হয়েছে করুণ! মিডডে হচ্ছে, কিন্তু মিল আসছে না! বাধ্য হয়েই চাল-ডাল রক্ষা করার জন্য তাদের মাস্টারমশাইরা একটা সিন্দুক, না না, সিন্দুকে কী হবে, একটা বাঙ্কারই বানিয়ে ফেলেছেন মাটির নিচে। কংক্রিটের বাঙ্কার। উপরে লোহার ঢাকনা। এবার আয় তো ব্যাটা হতচ্ছাড়া হাতি!

বোঝো কাণ্ড

মিয়াঁ-বিবি আলিপুরদুয়ারে বাড়ি ভাড়া করে থাকত আর কাজ করতে বাইরে যেত। এদ্দিনে জানা গেল তাঁদের কাজের 'ছিরি'। তেনারা একই কম্মে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু সেই বিশেষ 'কম্ম' যে যৌথ উদ্যোগে ছিনতাইকরণ, সে কি আগে কেউ সন্দেহ করেছিল গো! তাই ধরা পড়ার পর প্রতিবেশীরা গালে হাত দিয়ে বলছেন, 'বোঝো কাণ্ড!' পতির পুণ্যে সতীর পুণ্যের কথা না হয় জানতেম, কিন্তু পতির পাপে সতীর কন্ট্রিবিউশন? ডুয়ার্স ঘুরে ঘুরে ছিনতাইকাণ্ড সম্পাদন করতে করতে এই সে দিন তেনারা পুলিশের হাতে খপ হয়েছেন ধূপগুড়িতে।

কী করিলি

দিদি সুপ্রিমোর চালে জোর তালে পড়েছেন ভাই সুপ্রিমো। তৃণ সুপ্রিমো পাত্তাই দিচ্ছেন না গজমম সুপ্রিমোকে। তাই ভাই গিয়েছেন দিল্লি। অচিরেই দিল্লির যন্তর মন্তরে জোর আন্দোলন শুরু করে গোর্খাল্যান্ড আদায়ে আদা-জল খেয়ে নেমে পড়বেন তিনি। আলুওয়ালিয়া সাহেব নাকি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন 'হবে' বলে। তবে বিমলাগমনের সন্দেশ পেয়ে স্বরাষ্ট্রদাদা রাজনাথবাবু নাকি ভারী ব্যস্ততার চক্করে পড়ে গিয়েছিলেন। ফলে ভাইয়ের জন্য 'টাইম' মেলেনি তাঁর। হায়! দিদি নাই, দাদা নাই, একা কী যে করে ভাই!

কিম কাণ্ডম

একজন পড়ি-মরি করে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে পড়লেন আর পিছন পিছন উদ্যত অস্ত্র হাতে কয়েকজন! বানারহাটের হৃদয়পুর গ্রামে সে দিন প্রায় এইরকমই কাণ্ড! উল্কার বেগে গ্রিলের দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়লেন ভক্তবাহাদুরবাবু, আর পিছনে? আজ্ঞে হ্যাঁ! একখানা কুচকুচে বাইসন। রাস্তা থেকে তাড়া করে পলায়নকারীর ঘরেই ঢুকে পড়েছিল ব্যাটা! ঘরে ঢুকে আর যেতে চায় না। কোনওরকমে নিস্তার পেয়ে ভক্তবাবু বাইরে এলে এলাকার লোকজন থানা-পুলিশ,

চুড়েল, তোলাবাজ ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে বাইসনবাবাজিকে বার করে আনেন! বাইসনরা মাঝে মাঝে তেড়ে আসে বটে, কিন্তু বেডরুমে প্রবেশ করে হানাবাজি অব্যাহত রাখলে তো ভারী ঝামেলা! এর পর কি গার্লফ্রেন্ড নিয়ে গেরস্তের বাড়িতে আসবে নাকি? না হে! ভাবতেই কেমন উদাস উদাস লাগছে মামা!

ফিল্মি পুলিশ

ফিল্মি কায়দা কি শুধু ফিল্মেই চলে? না। মালবাজার থানার পুলিশ কর্তা ফিল্মি চাল দিয়েই রক্ষক হয়েছেন জোড়া তক্ষকের। খবর ছিল, একজোড়া আছে এলাকায়। পুলিশ কর্তা অমনি চাললেন মোক্ষম চাল।

নিজেই হয়ে গেলেন ক্রেতা। অভিনয়টাও নাকি অস্কার পাওয়ার মতোই হয়েছিল। তক্ষক বিক্রেতা লাখ তিরিশেক পেলে মাল ছেড়ে দিতে রাজি। অতঃপর বিক্রেতার আগমন এবং ক্রেতার স্বরূপধারণ। তিরিশ লাখের স্বপ্ন আপাতত ঠান্ডা ঘরে বসে দেখছেন বেচারা পাচারকারী। কেউ কেউ অবশ্যি বলছেন যে ব্যাপারটা পুরোটা গপ্প। তা গপ্প হলেও বাস্তবে যখন ধরা পড়েইছে, তখন বাপু সমালোচনা শুনব না।

আহা কৃষ

বেজায় আতান্তরে পড়েছেন মালদার কৃষ্ণেন্দুবাবু! হাত চিহ্ন নিয়ে বেশ তুলকালাম করছিলেন। হেনকালে ঘাসফুল ডাক দিয়ে বলল, 'এসো।' তিনি এলেন। ঘাসফুল বলল, 'তুমি থাকতে আর কে হবে পুরপতি?' ফলে তিনি তা-ই হয়ে থাকলেন। কিন্তু এখন নাকি ঘাসফুল দাঁত খিঁচিয়ে বলছে, 'থাকো এবং ভাগো।' মানে দলে থাকো, কিন্তু পুরপতির চেয়ার ছেড়ে দাও। কী অশৈলী কথা বলুন তো! চেয়ারম্যানকে চেয়ার ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব। এমন হলে বাবু বসবেন কোথায়? তাই জেদ ধরে তিনিও বলছেন, 'আমি যাব না যাব না যাব না রে!' কিন্তু বললে কী হবে? দুই গন্ডা কাউন্সিলর হুমকি দিয়ে বলছেন, 'যাবি না মানে? তবে অনাস্থা আনি!' আহা কৃষ! এবার কি ডিসমিস?

দা দা দা

নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাদেব ধাম এলাকার পুরুষদের কারও নাক কি কাটা গেল? ক'দিন আগেই গ্রামের নাগরিকরা, মানে ঘরের মেয়েরা ঝাঁটা, কোদাল, শাবল, চেলাকাঠ, খুন্তি, হাতা, রুটি বেলার বেলুন নিয়ে হানা দিয়েছিলেন বাজারে। তাঁরা কি বাজারে পিকনিক করতে এসেছিলেন? না রে দাদা! উক্ত দ্রব্যাদি আসলে ছিল তাঁদের অস্ত্র। খুবই অহিংস অস্ত্র, কিন্তু তার দাপটেই বাংলা দারুর দোকান থেকে সুরাপ্রেমীরা সেকেন্ডে হাওয়া হয়ে যায়। প্রায় হাজার বোতল বঙ্গ ভেঙে, দারুওয়ালার দোকান লাটে তুলে দিয়ে এমন প্রতিবাদ জুড়ে দিয়েছিল যে পুলিশ এসে এক বঙ্গবিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করে অবস্থা সামলায়। আসলে গ্রামের পুরুষকুলের কেউ কেউ এত্ত পান করা শুরু করে দিয়েছিল যে গ্রামের গেরস্থালি প্রায় উচ্ছন্নে যেতে বসেছিল। পুরুষ, থুড়ি প্রশাসন পঞ্চায়েতকে বলে কাজ না হওয়ায় অতঃপর উক্ত আক্রমণ এবং প্রচণ্ড সাফল্য। এখন নাকি নাককাটি চত্বরে কেউ 'দারু' উচ্চারণ করতেই সাহস পাচ্ছে না। কেবল বলছে 'দা'।

গো বেচারারা

চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্তে যেসব গোরু বিনা অনুমতিতে বিদেশ সফরের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়, তাদের নিলামে তুলে বেচে দেওয়াটাই নিয়ম। কিন্তু টাকা জনগণের ট্যাঁকের বদলে ছাপাখানায় আটকে যাওয়ার কারণে বেচারা গোরুগুলোর বড় দুর্গতি। এক হাঁটু পাঁকে দাঁড়িয়ে না থাকলেও খুব ঠাসাঠাসির জীবন যাপন করতে হচ্ছে। সীমান্তরক্ষীদেরও কাজ বেড়ে গিয়েছে। গোরু না বোঝে জওয়ান, না বোঝে কানুন। প্রবল হাম্বা রবে রাতের ঘুম লাটে তুলে দিতে তারা অলওয়েজ রেডি। তদুপরি গোবেচারাদের খাওয়ানোর কাজটাও তো করতে হচ্ছে রাইফেল সরিয়ে রেখে। বাজারে নোট আর খদ্দের কবে আসবে কে জানে! তদ্দিন গোভক্তির দেশে গোমানহানির অভিযোগ উঠলে আর দেখতে হবে না গো!

টুক্রাণু

ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া-এনসেফ্যালাইটিসের ত্র্যহস্পর্শযোগ ডুয়ার্সে। রায়গঞ্জে ব্যর্থ হল দানের চোখ। এবার বালুরঘাটে খোঁজ মিলল ডাক্তারবিহীন হাসপাতালের। রিলে পদ্ধতিতে তক্ষক পাচার করতে গিয়ে এক পাচারকারী পেল গিরগিটি! ফের অজানা জ্বরে মারা গেল এক যুবক দক্ষিণ দিনাজপুরে। রায়গঞ্জে জোর বোমাতঙ্কের প্রহর গণনার পর বেরুল না বোমা। নতুন দু'হাজার টাকার মতো দেখতে চিনে ব্যাগ ঢুকে পড়েছে ডুয়ার্সের বাজারে। পাহাড়ে অনেক রাস্তা কেবল পাথরস্তূপ। মানাবাড়ির কাছে নর্দমা থেকে ছাগল ছানাকে তুলতে গিয়ে মালিক 'হোলি হ্যায়'। বেছে বেছে কেন ওদলাবাড়ি এলাকাতেই হানা দেয় চিতা বাঘ, ভাবছেন কর্তারা। ডুয়ার্সের বিভিন্ন অরণ্যে হাতিদের বুদ্ধি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় মহাভাবনা। 'টোটো' জনজাতি এবার টোটো গাড়ির নাম বদলের দাবিতে তৎপর হচ্ছে।

ভিজে ভোট

দামি টাকার নোট বাতিল হওয়ার খবরের জোয়ারে কোচবিহারের উপনির্বাচন বিলকুল ভিজে গিয়ে মিইয়ে পড়েছিল। ভোট শিয়রে,

কিন্তু টিভিতে-কাগজে ছবি নেই। ভোটারদের মধ্যেও ভারী উদাসীন ভাব। লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে তাঁরা 'ভোট দেব' নীতির বদলে 'নোট নেব' নীতিতেই আগ্রহী বেশি! গরম গরম খবরও কিছু হচ্ছে না। এর মধ্যে অবশ্য বুথ নয়, গোটা একটা গ্রাম দখলের অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু সে নিয়েও পাত্তা দিচ্ছে কে বা? ভোট করতে যাওয়া কর্মীরাও বাংলার পাঁচ-এর মতো মুখে নাকি আঙুলে কালি মাখিয়েছেন। ভোট করতে যাওয়ার টাকা এটিএম থেকে তুলতে পারেননি যে! দূর! দূর! নোট না থাকলে কিছু জমে নাকি? ভা-রী পানসে গেল ভোটটা।

তিস্তাবঙ্গের প্রাচীন মেলাগুলি ধর্মীয় উৎসব ঘিরে হলেও এখন সার্বজনীন

কখনও কোনও মজে যাওয়া নদীকে ঘিরে, কখনও কোনও জনপদে বা পাহাড়ে, বহুদিন ধরে চলে আসা গ্রামীণ মেলাগুলি আজও বয়ে চলে প্রাচীন লোককথা বা ইতিহাস। নানা সংস্কৃতির ধারা বারবার এসে মিশেছে ডুয়ার্সে, তার খোঁজখবর মেলে এইসব মেলাতেই। আজ দ্বিতীয় পর্বে সেসবেরই হদিশ দিচ্ছেন **গৌতম গুহ রায়**।

র‍্যাল্‌ফ ফিচ নামে জনৈক দুঃসাহসী ইংরেজ বণিক ১৫৮৪-তে ১৮০টি নৌকো বোঝাই বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে আগ্রা থেকে গোটা উত্তর ভারত ঘুরে নদীপথে এখানে এসে পৌঁছান। লক্ষ্য ছিল এই পথ দিয়ে তিব্বত পর্যন্ত বাণিজ্যপথ ব্যবহারের। এই ঘটনায় এই অঞ্চলের বাণিজ্যপথের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। পার্বত্য বাণিজ্য জলপাইগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ ভুটান মারফত তিব্বত, চিন প্রভৃতি দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘটত। ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্যের পাঁচটি দুয়ার এই জেলার উত্তরের সীমা। এখানেই বিভিন্ন কেন্দ্র বাণিজ্যিক পণ্য বিনিময় ও আদানপ্রদানে ব্যবহৃত হত। জর্জ বোগেলের বিবরণী থেকে সে সময়ের বিপণনসামগ্রীর খোঁজ পাওয়া যায়। চিনা বণিকরা চা-পাতা, নানা ধরনের রেশমি কাপড়, সুতো, পেলঙের রুমাল, পশুর চামড়া, চিনামাটির বাসনকোশন ও ছুরি-কাঁচি, তামাক প্রভৃতি নিয়ে আসতেন। বিনিময়ে সোনা, মুক্তো, প্রবাল ও বিভিন্ন সামুদ্রিক পাথর, কাপড়চোপড় নিয়ে যেতেন। ভুটানিরা সাধারণত চাল, লোহা, পশম, চা, সৈন্ধব লবণ, পশম ও ভেড়ার চামড়া প্রভৃতি নিয়ে আসতেন। বিনিময়ে নিয়ে যেতেন খাদ্যসামগ্রী, লবণ ও বস্ত্রাদি। অতীতের জলপাইগুড়ির বিভিন্ন মেলায় সমাগত ব্যাপারীদের বিপণনসামগ্রীতেও বিশেষ গুরুত্ব পেত উপরোক্ত সামগ্রীসমূহ। এ ছাড়া সরকারি নথিতে প্রাপ্য তথ্যে ঊনবিংশ শতকের শেষ অর্ধে, জেলা গঠনের প্রাক্‌পর্বে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্যের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল— তৈলবীজ, সুপারি, তুলো, লাক্ষা, ভুটিয়া কম্বল, ঘোড়া, চামড়া, ঘি, মোম, কস্তুরী, পাট ও কাঠ, তামাক প্রভৃতি। বিনিময়ে পিতলের বাসনকোশন, লবণ, ভোজ্য তেল, সুতিবস্ত্র, মশলা, নারকেল, চিনি, গুড় প্রভৃতি বিপুল পরিমাণে আমদানি হত। এই সামগ্রীগুলিকে নিয়ে মেলাগুলোরও বিপণন জমত। তবে এ কথাও ঠিক যে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে

ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন লৌকিক দেবতা বা লোককাহিনি/ লোকবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যে মেলাগুলো বসত, সেইসব ছোট ছোট মেলায় মূলত স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন চাহিদার সামগ্রী এবং তৎসহ খাবারদাবার মুখ্য বিপণনসামগ্রী হত। এ ক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্ব পেত মাছ ধরার বাঁশের তৈরি বিভিন্ন সরঞ্জাম, কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রভৃতি।

শুধু বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বা ধর্মীয় উৎসব থেকেই নয়, মেলার জন্ম হয় এক সামগ্রিক সামাজিক তাগিদ থেকে। তবে মেলার চরিত্রানুযায়ী একে দু'ভাগে ভাগ করেন অনেক আলোচক, যেমন ধর্মীয় মেলা ও ধর্মনিরপেক্ষ মেলা। অনেকেই আবার এই ধর্মীয় মেলাকেও ধর্মীয় পরিচিতির নিরিখে বিভাজন করেন। তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ মেলাকেও নানা ভাগে ভাগ করা যায়— আদিবাসী মেলা ও উৎসব, নাগরিক মেলা, সরকারি উদ্যোগে সংগঠিত মেলা ও উৎসব প্রভৃতি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রাচীন মেলাগুলোতে ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকলেও তা বিশেষ ধর্মীয় পরিচয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে সর্বধর্মের সমন্বিত মেলা হয়ে উঠেছে। তবে ধর্মীয় মেলাগুলোর সঙ্গে সেই অঞ্চলের বিশেষ কোনও ধর্মীয় 'উপকরণ' যুক্ত থাকে, বিশেষ কোনও আরাধ্য দেবদেবী বা পির-পয়গম্বরের নামের সঙ্গে এইসব মেলার উদ্ভব ও বিকাশ জড়িত। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ মেলার উদ্ভবের পিছনে থাকে ওইসব এলাকার বাণিজ্যিক প্রয়োজন ও গুরুত্ব বা সামাজিক ঘটনাবলির কারণে সমবেত থাকার তাগিদজাত আবেগ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাবলি বা বিশেষ কোনও লৌকিক কাহিনি বা কল্পকাহিনিকে ভিত্তি করে ধর্মীয় মেলা গড়ে উঠলেও অধিকাংশ মেলা, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ মেলাগুলোর পিছনে থাকে ওই অঞ্চলের মানুষের প্রত্যক্ষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাগিদ। উত্তরবাংলা বা আজকের জলপাইগুড়ির বিভিন্ন মেলার ক্ষেত্রেও এই তাগিদ অনুঘটকের কাজ করছে।

এই অঞ্চলের প্রাচীন ও প্রধানতম মেলাগুলির মধ্যে শীর্ষে থাকবে জল্পেশ মেলা। ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দিরকে ঘিরে এই মেলা। জল্পেশ শিবের মন্দির। শিবকে নিয়ে নানা রূপে নানা দেবতার মন্দির রয়েছে গোটা বাংলা জুড়ে, এবং এঁকে ঘিরে মেলা ও উৎসবের সংখ্যাও অগণিত। এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ করতে হয় ৪ নং দামোদরপুর লিপির কথা। এর উল্লেখ অনুযায়ী পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গের এক দুর্গম প্রান্তে লিঙ্গরূপী শিবের পূজা প্রবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মুখ্যতম দেবতা হলেন শিব। এই অঞ্চলের শৈবধর্মই পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের অন্যত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।' পরবর্তীতে বিভিন্ন শতক জুড়েও এই শৈবধর্মের ব্যাপক বিস্তারের উদাহরণ এই জেলায় ছড়িয়ে আছে। ময়নাগুড়ি এর এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রভূমি। লোকপ্রবাদ অনুযায়ী জলপাইগুড়িকে তিন ঈশ্বরের দেশ বলা হয়— জল্পেশ্বর, জটিলেশ্বর ও বটেশ্বর। এই তিন 'ঈশ্বর' শিবের তিন নাম এবং এই তিন

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রাচীন মেলাগুলোতে ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকলেও তা বিশেষ ধর্মীয় পরিচয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে সর্বধর্মের সমন্বিত মেলা হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলি বা বিশেষ কোনও লৌকিক কাহিনি বা কল্পকাহিনিকে ভিত্তি করে ধর্মীয় মেলা গড়ে উঠলেও অধিকাংশ মেলা, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ মেলাগুলোর পিছনে থাকে ওই অঞ্চলের মানুষের প্রত্যক্ষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাগিদ।

শিবের মন্দিরই রয়েছে ময়নাগুড়িতে। এর অন্যতম জল্পেশের মন্দির, এর পিছনে রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাসাশ্রয়ী মিথ। জল্পেশ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা অনতিক্রম্য। এখানে শিবরাত্রির সময় ফাল্গুন মাসে মেলা বসে। এই মেলা অনেক প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। এই প্রাচীনত্ব জানতে হলে এই মন্দির ঘিরে, এর প্রতিষ্ঠা ঘিরে যে কাহিনি রয়েছে, তার অনুধাবন প্রয়োজন। জল্পেশের ঐতিহ্য ও ইতিহাস, পরম্পরা নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা আবশ্যিক। তাই সেই বিস্তারিত আলোচনায় আসছি না এখানে।

অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'কামাখ্যা মহাপীঠে শ্রীশ্রীউমানন্দ ভৈরব, বৈদ্যনাথধামের শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ ইত্যাদি যেমন অনাদিলিঙ্গের প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বরও তদ্রূপ। স্থানটি ভারতের একান্নপীঠের একটি বিধায়।' জল্পেশ মেলা অনুষ্ঠিত হয় শিবরাত্রি উপলক্ষে, শিবচতুর্দশীতে। পক্ষকালব্যাপী এই মেলা সুপ্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। এই মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে চলছে জর্টিদা, আজকের জরদা নদী। এই নদীতে স্নান করে পুণ্যার্থীরা এই অনাদিলিঙ্গের পূজা দেন। এ ছাড়া সাম্প্রতিক অতীতে শ্রাবণ ও বৈশাখ মাসে এই মন্দিরকে ঘিরে পুণ্যার্থীদের বিপুল সংখ্যায় সমাগম ঘটছে। দুই দশক ধরে, বিশেষ করে শ্রাবণ মাসের সোমবার ভোরে এখানে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হচ্ছে। এবং এই সময় উত্তরবাংলা ছাড়াও আসাম, নেপাল, ভুটান থেকেও পুণ্যার্থীর সমগাম ঘটছে এবং এই উপলক্ষে মেলা বসছে। তবে জল্পেশ মেলা বলতে এখনও শিবচতুর্দশীতে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠেয় মেলাকেই বোঝায়।

জল্পেশ মন্দিরকে ঘিরে এ সময় যে মেলা বসে তা প্রাচীনকাল থেকেই পার্বত্য রাষ্ট্র ও এই সমতলের ব্যাপারীদের সামগ্রী বিনিময়ের সংযোগ সেতু হিসেবে ভূমিকা নিয়ে আসছে। সম্প্রতি জেলা প্রশাসন এই মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে মন্দির কমিটির সঙ্গে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পরিচালনায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে অতীতের সেই আকর্ষণকে। লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান ঘিরে এখানে সহস্র মানুষ সমবেত হন, বিশাল মঞ্চে পালাটিয়া, লোকনাট্য, ভাওয়াইয়া, কুষাণগান, বিষহরা প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়। লোকনাট্যর অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রাম থেকে শতাধিক পালাগানের দল এতে অংশ নিতে আসেন। মেলা নিছক জনসমাগম বা বিপণনসর্বস্বতা নয়, একে ঘিরে এই অঞ্চলের মাটির সংস্কৃতি নতুনভাবে জেগে উঠছে।

জল্পেশ মেলার মতো প্রাচীন নয়, কিন্তু জেলার অন্য যে মেলা তার সাম্প্রতিক বৈভবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে তা হল হ্যামিলটনগঞ্জের কালী পূজার মেলা। গোটা বাংলাতেই শক্তির আরাধনা প্রচলিত ছিল, কালীই সেই আরাধ্যা দেবী। এখানেও লৌকিক দেবী হিসেবে কালীকে আরাধনা করা হয়ে আসছে। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে কালীর আরাধনা, পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে ব্যাপক মেলার

ডুয়ার্সে চা-বাগান পত্তন, কাঠের কারবার ফুলেফেঁপে ওঠা ও এর পর রেলপথ চলে আসা এর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক সমীকরণটাই পালটে দিয়েছিল। এই পরিবর্তিত অবস্থায় বিভিন্ন সময়ের বিদেশি, বিশেষত ব্রিটিশ আধিকারিকদের এই অঞ্চলের মানুষের অনেক নৈকট্যে আসার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এমনই উদাহরণ হ্যামিলটনের কালী পূজা ও তার মেলা।

আকৃতি নেওয়ার উদাহরণও প্রচুর রয়েছে। এবং এর পরিচালনভার পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের হাতে বর্তায় এবং বারোয়ারি পুজোর চেহারা নেয়। জলপাইগুড়ি জেলা শহর, গ্রামেগঞ্জে দুর্গা, কালী, বাসন্তী থেকে হাল আমলে সরস্বতী, কার্তিক পুজোতেও এই বারোয়ারি উদ্যোগ দেখা যায়। ডুয়ার্সে চা-বাগান পত্তন, কাঠের কারবার ফুলেফেঁপে ওঠা ও এর পর রেলপথ চলে আসা এর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক সমীকরণটাই পালটে দিয়েছিল। এই পরিবর্তিত অবস্থায় বিভিন্ন সময়ের বিদেশি, বিশেষত ব্রিটিশ আধিকারিকদের এই অঞ্চলের মানুষের অনেক নৈকট্যে আসার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এমনই উদাহরণ হ্যামিলটনের কালী পূজা ও তার মেলা। এক ইংরেজ সাহেবের উদ্যোগে জেলার প্রত্যন্ত চা-বাগিচাময় অঞ্চল কালচিনিতে উল্লিখিত কালী পূজাটির সূচনা। হ্যামিলটনের নামেই আজকের হ্যামিলটনগঞ্জ। সেখানে ওয়াকার নামে এক ইংরেজ ১৯৭১ সালে একটি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দৈনিক পূজা হয়ে আসছে এখানে অদ্যাবধি। প্রাচীন মন্দিরটি বছর দুয়েক আগে সংস্কার করা হয়। মাটির মূর্তি পালটে পাথরের স্থায়ী মূর্তি বসেছে। ১৯৩৫ সালে ওয়াকার সাহেব এই মেলা পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেন হ্যামিলটন সাহেবের হাতে। এর পরই মেলার সূচনা, সম্ভবত ১৯৩৮ থেকে। বর্তমানে এর পরিচালনভার ‘হ্যামিলটনগঞ্জ কালীবাড়ি পূজা কমিটি’র হাতে এবং এর সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন যুক্ত রয়েছে, জেলা প্রশাসন থেকে জেলা পরিষদ— সবাই একে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব তুলে নিয়েছে। বর্তমানে তেরো দিন ধরে মেলা বসে। তবে অতীতে তেমন ছিল না। মূলত চা-বাগানের শ্রমিকদের সম্মিলনই ছিল মেলার প্রাণশক্তি। পাঁচ-ছ’দিন ধরে এখানে মেলা বসত। চা শ্রমিকরা গৃহস্থালির জিনিসপত্র কিনতেন। আশপাশের সাঁতালি, বেন্দাবাড়ি, হাসিমারা, জয়গাঁ, কালচিনি, সেন্ট্রাল ডুয়ার্স, আলিপুরদুয়ার, বিন্নাগুড়ি প্রভৃতি জায়গা থেকে চা শ্রমিকরা আসতেন। মেলাটি হিন্দু দেবীর পূজা উপলক্ষে হলেও তার কোনও সাম্প্রদায়িক চরিত্র ছিল না। আদিবাসী, হিন্দু-মুসলিম, খ্রিস্টান— সবাই এখানে সমবেত হতেন সানন্দে। সম্প্রীতির বাতাবরণ আজও অব্যাহত। তবে মেলাটি আয়তনে বেড়েছে অনেক, যেমন হ্যামিলটনগঞ্জও আর গঞ্জ নেই, এক ক্রমবিকাশশীল শহরে পরিণত হয়েছে। আজ মেলা উপলক্ষে কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকা, শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর, চুঁচুড়া এবং উত্তরবাংলার কোচবিহার, দার্জিলিং ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্য আসাম ও প্রতিবেশী দেশ ভুটানের ব্যাপারীরা মেলায় সামগ্রী নিয়ে আসছেন। কাশ্মীরি শীতবস্ত্র, ভুটানি উলের পোশাক থেকে বিভিন্ন সামগ্রীর উপহার নিয়ে আজ এই মেলা বিশাল আকার নিয়েছে। প্রায় এক হাজার দোকান বসে এই মেলায়। বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে এখানের সাম্প্রতিক বিপুল জাঁকজমকের সঙ্গে সংগতি রেখে— সার্কাস, নাগরদোলা, জাদু খেলাসহ বিভিন্ন ব্যবস্থার পাশাপাশি রকমারি খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও আকর্ষণের কারণ হয়ে উঠছে।

রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে কালী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ লৌকিক দেবী। বস্তুত, উত্তরবঙ্গে লৌকিক শিব ঠাকুরের মতোই বহুল পূজিত এই লৌকিক কালী। গারাম ঠাকুরের থানে ধান রোপণের পূর্বে যে পূজা হয়, সেখানে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে কালী ঠাকুরেরও সমারোহের সঙ্গে পূজা করা হয়। এ প্রসঙ্গে ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায় লিখেছেন, ‘গ্রামে ওলাউঠা, কলেরা ইত্যাদির ন্যায় মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে ওঝা বা দেউসি গ্রাম ঠাকুরের থানে কালী ঠাকুরানির পূজা দেন।’ গ্রাম ঠাকুরের থান ব্যতীত অন্য থানগুলো হল বাঁচকালী, হাওয়াকালী, ভদ্রকালী— এই তিন দেবতা আসলে তিন বোন। দীপাবলির সময় রাজবংশী সমাজও কালী পূজায় শামিল হন। দীপাবলিকে বলা হয় ‘গছা দেওয়া’। কালী পূজার সময় কালী ঠাকুরের পূজা পুরোহিত দর্পণ মেনে ব্রাহ্মণ্যমতেই হয়, তবে অতীতের মতো বেশ কিছু স্থানে কালী পূজায় রাজবংশীদের নিজস্ব অধিকারীই পূজা করেন এবং পূজার মন্ত্রও স্থানীয় লোকভাষাতেই হয়। এখানে কালী ঠাকুরের লৌকিক রূপ আঠারোটি।

আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম থানার পাগলার হাটে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালী পূজাকে ঘিরে মেলা বসে আসছে বহুকাল আগে থেকে। লোকবিশ্বাস, পাগলার হাটের মেলার বয়স একশো বছর পার হয়ে

আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম থানার পাগলার হাটে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালী পূজাকে ঘিরে মেলা বসে আসছে বহুকাল আগে থেকে। লোকবিশ্বাস, পাগলার হাটের মেলার বয়স একশো বছর পার হয়ে গিয়েছে। চার-পাঁচ দিন ধরে চলে নানা ধর্ম ও বর্ণের মানুষের এই সম্মিলন।

গিয়েছে। চার-পাঁচ দিন ধরে চলে নানা ধর্ম ও বর্ণের মানুষের এই সম্মিলন। আগে দু’দিন ধরে চললেও মাঝে তা মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পাঁচ দিনের মেলায় পরিণত হয়েছিল, এখন অবশ্য চার দিন ধরে চলে। কুমারগ্রাম থানার দক্ষিণ হলদিবাড়ি, পোখারিগ্রাম, বাতাবাড়ি, কুমারগ্রামদুয়ার, সিঙ্গিমারি, দুর্গাবাড়ি, চেংমাড়ি, দলদলি

প্রভৃতি গ্রাম থেকে আসা মানুষজনের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী চা-বাগান— কুমারগ্রাম চা-বাগান, সংকোশ, নিউল্যান্ডস থেকে চা শ্রমিকরা এবং সংলগ্ন রাজ্য আসাম, প্রতিবেশী দেশ ভুটান থেকে মানুষ ও ব্যাপারীরা এই মেলার পসরা নিয়ে আসেন। এখানেও আগে ছিল মাটির কালীমূর্তি, যা বর্তমানে পাথরের। আগে একটি বড় পাকুড় গাছের ছায়ায় খড়ের চালাঘরে মন্দির ছিল, যা এখন পালটে গিয়ে বর্তমানের হর্ম্য চেহারা নিয়েছে। এর দেউড়ি রাজবংশী মানুষ, পুজো উপলক্ষে 'মানত' করা পাঁঠা, পায়রা থেকে চালকুমড়ো বলির প্রথা রয়েছে। শতাধিক পাঁঠা ও প্রচুর পায়রা এখানে বলিপ্রদত্ত হয়। এই পাগলাহাটের কালীমণ্ডপকে ঘিরেও একটি প্রাচীন মিথ রয়েছে। হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়া এক যুবক এই স্থানে ঘুরে বেড়াত। লোককথা এই যে, তাকে এই স্থানে কালী পূজার জন্য দেবী স্বপ্নাদেশ দেন, সেই থেকেই পূজা ও মেলার প্রচলন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'বোড়োগনের মধ্যে প্রকৃতি পরিদৃশ্যমান রূপের পিছনে যে শক্তি বিদ্যমান তাহারই পূজা সাধারণ। ইহারা এক জগৎ পিতা ও জগন্মাতা আস্থাশীল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিব ও শক্তির মতো এই দুই প্রধান দেবতা ভিন্ন অন্য নানা দেবতায় ইহাতের বিশ্বাস আছে। শূকর প্রভৃতি পশুবলি ইহাদের পূজার একটি প্রধান অনুষ্ঠান।'

ধূপগুড়ির ঠাকুরপাটে ঢ্যাংকালীর মেলা। ওই এলাকার এক বিখ্যাত মেলা। কালী পূজার সময় এই মেলা হয়। একে ঘিরে ধূপগুড়ি, গয়েরকাটা, বানারহাটসহ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আনন্দে মেতে ওঠেন। রাজগঞ্জ থানার বেশ কয়েকটি মেলার উল্লেখ এখানে করতে হয়। তালমাহাটের মেলাও প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন। ৮ বিঘা জমি নিয়ে ব্যাপ্ত মাঠে মেলা বসত। জলপাইগুড়ির রায়কত বা রাজ-উদ্যোগে এই পূজার আয়োজন হত। তালমাহাট থেকে ৭/৮ কিলোমিটার দূরের বড় বাড়ির মেলাও অনেক প্রাচীন, অনেকেই মনে করেন এই মেলার প্রাচীনত্ব দুই শতাব্দীর। আজ এই বৈভব কমলেও এখনও এই মেলায় জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, শিলিগুড়ি থেকে বহু মানুষ আসেন। এই মেলাতেও লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে থাকে।

ময়নাগুড়িরই পদমতী গ্রামে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় ভদ্রকালী পূজা উপলক্ষে প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন এই মেলা আজও হয়ে আসছে। এ ছাড়াও ময়নাগুড়িরই 'পেটকাটি মাও'য়ের মন্দিরের সামনে কার্তিক মাসের কালী পূজা উপলক্ষে মেলা হয়। এই

ধূপগুড়ির ঠাকুরপাটে ঢ্যাংকালীর মেলা। ওই এলাকার এক বিখ্যাত মেলা। কালী পূজার সময় এই মেলা হয়। একে ঘিরে ধূপগুড়ি, গয়েরকাটা, বানারহাটসহ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আনন্দে মেতে ওঠেন। রাজগঞ্জ থানার বেশ কয়েকটি মেলার উল্লেখ এখানে করতে হয়। তালমাহাটের মেলাও প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন।

পেটকাটি মাও বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। ময়নাগুড়ির রেল স্টেশনের কাছে ব্যাঙ্কবন্দি গ্রামে এক অখ্যাত মন্দিরে কৃষ্ণপাথরের এই রহস্যময়ী দেবীমূর্তি পেটকাটি মাও। রহস্যাবৃত্ত অবগুণ্ঠনের আড়ালে এই দেবী কালী, চণ্ডী, নাকি তন্ত্রসাধনার কোনও যোগিনী মূর্তি অথবা বৌদ্ধ প্রভাবের তন্ত্রমূর্তি, যাতে তিব্বতি প্রভাব রয়েছে স্পষ্টভাবে— তা নিয়ে গবেষকদের নানামত। তবে স্থানীয় মানুষ একে শক্তিমূর্তি ধরে নিয়ে শক্তিমতেই পুজো করে। এই পুজো উপলক্ষে মেলা বসে।

গ্রাম্য মেঠো পথের এক বাঁকে ছোট, বাহুল্যবর্জিত এই পেটকাটি মন্দির। কিছুদিন আগেও এখানে নিছকই বেড়ার ঘর ছিল, টিনের ছাউনি। সাম্প্রতিককালে পাকা ঘর হলেও সম্পূর্ণ অরক্ষিত পড়ে থাকা এই মূর্তিটি উত্তরবাংলার অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও। পেটকাটি মাও মানে রাজবংশী ভাষায়— যে দেবীর পেট কাটা, আসলে অস্থিচর্মসার দেবীমূর্তি। 'রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল'-এ ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল একে চামুণ্ডা চণ্ডী বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এ বিষয়ে একমত নন ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়। অতীতের তন্ত্র প্রভাব এতে রয়েছে বলেই মনে করেন অনেক গবেষক। রত্নপীঠ বলে এক সময়ের প্রসিদ্ধ অঞ্চলের অন্তর্গত এখানে তন্ত্রসাধনা ব্যাপ্ত ছিল, যার প্রভাব আজও গানে, শিল্পে, লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ তন্ত্র প্রভাব মাসানচিত্র থেকে তুক্ষ্যাগান-এ তার ছাপ রেখে যায়। পেটকাটি মাওয়ের মূর্তিটিও সম্ভবত তন্ত্রসাধনার মূর্তি। উচ্চতা সাড়ে সাত ফুট, দৈর্ঘ্য ২ ফুট ৭ ইঞ্চি, চওড়া ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি। কালো কষ্টিপাথরের মূর্তিটি দশভুজা। দেবীর বাঁ দিকে পাঁচটি হাত। চারটি হাতে হস্তী, ঘণ্টা, একটি ছিন্ন নরমুণ্ড, একটি নরমূর্তি রয়েছে, পঞ্চম হাত ভাঙা। ডান দিকে পাঁচটি হাতের একটিতে হস্তীর মুখের দিক ধরা আছে, দু'টি হাতে কঙ্কাল ও বাদ্যযন্ত্র, অপর দু'টি হাত ভাঙা। দেবীর অলংকার বলতে সাপের কর্ণাভরণ, সাপের মুকুট। গলায় নরমুণ্ডমালিকা, সর্বাঙ্গে সাপের মালা। অস্থিসার শরীরে দেবীর পেট কোটরে নিমজ্জিত, তাতে একটি বৃশ্চিক নিপুণভাবে খোদিত। দু'টি বিস্ফারিত চোখ ছাড়াও কপালে আরও একটি চোখ। পয়োধর ঝুলে পড়া। পায়ের নিচে একটি নারীমূর্তি। একপাশে শেয়াল, অপর পাশে পেঁচার মূর্তি। এই মূর্তিটি কোথা থেকে আনা হয়েছিল তা নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। কারও মতে, এটি তিব্বত থেকে আনা। কোনও কোনও গবেষক একে দেশীয় শিল্পীদের শিল্পকর্ম বলে মনে করেন। তবে ওড়িশার হীরাপুর ও উত্তরপ্রদেশের বান্দ্রা জেলায় পাওয়া চামুণ্ডার যোগিনীর ভয়াল মূর্তির সঙ্গে এর গড়ন সাযুজ্য রয়েছে, যা ইতিহাসের অনুদ্ঘাটিত

ময়নাগুড়িরই পদমতী গ্রামে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় ভদ্রকালী পূজা উপলক্ষে প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন এই মেলা আজও হয়ে আসছে। এ ছাড়াও ময়নাগুড়িরই 'পেটকাটি মাও'য়ের মন্দিরের সামনে কার্তিক মাসের কালী পূজা উপলক্ষে মেলা হয়।

অধ্যায়ের রহস্য উন্মোচনের জন্য গবেষণার দাবি রাখে। তবে এই পেটকাটি মাওকে ঘিরে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় যে মেলা বসছে তা খুব বেশি প্রাচীন নয়। স্থানীয় মানুষের উদ্যোগেই মেলাটি বসে। মেলা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে মন্দির কমিটি। ময়নাগুড়ির বিভিন্ন গ্রাম থেকে সহস্র মানুষের সমাগম ঘটে এ সময়।

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহরের উত্তরে বোদাগঞ্জে তিস্তার ধারে নতুন একটি মেলা জমে উঠছে। ত্রিস্রোতা সতীপীঠ বা ভ্রমরী দেবীকে ঘিরে এই মেলা। স্থানীয় আয়োজকদের দাবি, এটি পুরাণ উল্লিখিত সতীর একান্নপীঠের অন্যতম 'ত্রিস্রোতা' তীর্থ, যেখানে সতীর বাঁ পা পড়েছিল। ভৈরব বলেন, ঈশ্বর-দেবী ভ্রামরী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবী মন্দিরটি সাম্প্রতিক সময়ে নির্মাণরত। এই স্থানের অন্য আকর্ষণ দু'টি বট গাছ, যাদের মাথা প্রাকৃতিকভাবে এক হয়ে মিশে আছে। মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে এখানে বিশেষ পুজো হয় এবং ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে এই পূজা উৎসব, মেলাও বসছে।

ধূপগুড়িতেও কালী পূজা উপলক্ষে বেশ কয়েকটি গ্রামীণ মেলা বসে। এর মধ্যে রয়েছে পূর্ব মল্লিকপাড়া কালীবাড়ির মেলা। কালীবাড়ির সামনের মাঠে বেশ প্রাচীনকাল থেকে মেলা বসছে। এই মেলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ বলা যেতে পারে। জলপাইগুড়ির নবাব পরিবারের পুরুষ মোশারফ হোসেনের জমিতে, এদের আয়োজনেই এই মেলার সূচনা। প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমি নিয়ে মেলার প্রাঙ্গণ। স্থানীয় গোপালপুর, বীরপাড়া, দলগাঁও, ডিমডিমা, বাগডি লা প্রভৃতি চা-বাগানের আদিবাসী শ্রমিকরা এই মেলায় শামিল হন। আদিবাসী নৃত্য ও গানের মধ্যে দিয়ে চা শ্রমিকরা তাদের সাময়িক আনন্দ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে এই দু'দিনের আনন্দমেলায়। একসময় এখানে 'রামলীলা' যাত্রাপালা হত। ফালাকাটার প্রমোদনগরের কালী পূজার মেলাও বেশ প্রাচীন। এর থেকে অপেক্ষাকৃত নবীন আলিপুরদুয়ারের শালকুমারের হাটের কালী পূজার মেলা। প্রতি বছর কার্তিক মাসের সময় মুনশিপাড়াতে এই মেলা বসে। পূর্বেই এই মেলার উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তাহাধিককাল চলে মেলাটি। খাওয়াদাওয়ার নানারকম দোকানের পাশাপাশি সাংসারিক খুঁটিনাটি, মনিহারি জিনিসপত্র ও আসবাবপত্রাদি এই মেলার কেনাবেচার আকর্ষণ। মনোরঞ্জনের জন্য সার্কাস থেকে পালাগান— সবই মজুত থাকে।

আরও একটি মন্দির ও তাকে ঘিরে সংগঠিত মেলারও উল্লেখ প্রয়োজন। এটি রাজগঞ্জ থানারই শিকারপুরের সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্দির, অনেকে বলেন দেবী চৌধুরানির মন্দির। বঙ্কিমচন্দ্রর উপন্যাসের কারণে 'দেবী চৌধুরাণী' আজ প্রসিদ্ধ নাম। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভবানী পাঠক ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অনুষঙ্গও। তবে বঙ্কিমচন্দ্র এদের ঐতিহাসিক চরিত্র বলে দাবি করেননি এবং উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্কের কথাও বলেননি। ইতিহাসের গবেষকদের অভিমত যে, শিকারপুরের এই ভবানী পাঠকের বা সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্দির বা জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন গোশালা মোড়ের দেবী চৌধুরানি মন্দিরের ভিত্তি যতটা না ঐতিহাসিক, তার থেকে কল্পনার নির্মাণই বেশি।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমের বেলাকোবা রেল স্টেশনের নিকটবর্তী শিকারপুরে এই সন্ন্যাসী মন্দির। শিকারপুর চা-বাগান সংলগ্ন হাটের পাশে কাঠের এই মন্দিরটিতে ১০টি কাঠের মূর্তি রয়েছে। বাইরে পাথরের একটি বৃষমূর্তি রয়েছে। সিঁড়ির ধাপে সিংহমূর্তি। স্থানীয় গবেষক নির্মল চৌধুরীর মতে, বিশ্ব সিংহের ভাই রায়কত বংশের প্রতিষ্ঠাতা শিষ্য সিংহ এটি প্রথম তৈরি করেন। পরবর্তীতে স্কট বা হাটিংস সাহেব এর পুনর্নির্মাণ করেন। অতীত যা-ই হোক, বর্তমানে মেলাটি আইনি লড়াইয়ের কারণে স্থান পালটে যেখানে আছে, সেখানে কার্তিক মাসে মেলা বসে একে ঘিরে। আশপাশের গ্রাম ছাড়াও অনেক উৎসুক মানুষ দূরদূরান্ত থেকে আসেন মেলায়। গোটা জলপাইগুড়ি জুড়েই কালী পূজা উপলক্ষে গ্রামেগঞ্জে মেলা বসে। এ সময় উৎসবের হাত ধরে আনন্দের এক জোয়ার আসে।

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

ডুয়ার্সের কিস্‌সা কাহানি

কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম পঞ্চায়েত— দৈর্ঘ্যে আনুমানিক দশ কিলোমিটার এবং প্রস্থে পাঁচ কিলোমিটার। মূল যে পাকা রাস্তাটি গাঁয়ের মাঝ বরাবর চলে গেছে সে রাস্তায় অবশ্য এখনও বাস চলাচল করে না। পরিবহণ বলতে কিছু বেসরকারি ভ্যান, ট্রেকার, অটো। প্রায় একশো শতাংশ কৃষিজীবীদের এই গ্রামে ব্যাঙ্ক সাকুল্যে দুটি, কোনও এটিএম কাউন্টার নেই। তার একটিতে রয়েছে হাজার সাতেক অ্যাকাউন্ট, যার অর্ধেকই শূন্য ব্যালান্সের জনধন অ্যাকাউন্ট। সপ্তাহান্তে যে ব্যাঙ্কে জমা পড়ত মেরেকেটে লাখ পনেরো, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর ১০ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বর অব্দি মোট ১৪ দিনে সে ব্যাঙ্কে মোট জমার পরিমাণ ছিল প্রায় দু'কোটি টাকা। অবাক হলেও এই তথ্যে কোনও ভ্রান্তি নেই, ত্রুটি নেই। মোদিসাহেব ভুল করেছেন না ঠিক করেছেন তা বোঝার সময় সুযোগ এখনও সাধারণ মানুষ পায়নি, তবে 'কালাধন' বলতে যে কেবল মাফিয়া, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা নেতা-মন্ত্রীদের লুক্কায়িত ধনের কথাই তিনি বলেন নি, ছাপোষা জনগণের পুরনো অভ্যেসেও আঘাত করেছেন, ডুয়ার্সবঙ্গের এই একটি অঞ্চলই তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

উত্তরপক্ষ

বাড়িতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যাশ টাকা জমিয়ে রাখা গর্হিত অপরাধ। দেশজুড়ে নোটের আকাল। আমরা প্রবেশ করতে চলেছি ক্যাশলেস যুগে। যেখানে মান্ডিতে, মলে, মাছের বাজারে, মেলায় চালু থাকবে কেবল ডেবিট কার্ড। সাধারণ মানুষ আজকের কষ্ট শিগগির ভুলে গিয়ে কাল অভ্যস্ত হয়ে যাবে নতুন ব্যবস্থায়। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা কীভাবে করবে ডুয়ার্সের অন্ধকার জগৎ?

চারদিকে এমন হাহাকার আগে কখনও দেখেনি এই প্রজন্মের মানুষ। ব্যাঙ্কে টাকা অথচ চাইলেই ক্যাশ তুলে খরচের উপায় নেই। এটিএম প্রায় সবই বন্ধ, যে ক'টিতে আছে লম্বা লাইন। দেশে যুদ্ধ ঘোষণা হলে বোধহয় চেহারা এমনটাই হত। রাস্তাঘাটে, দোকানে, বাজারে লোক নেই—খা খা করছে শপিং মল, ট্রেনের রিজার্ভেশনও মিলছে সহজেই। এ তো এক ধরনের নীরব যুদ্ধ— ব্যাখ্যা করলেন সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ, জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা। গত পনেরোদিন ধরে যিনি পেনশনের টাকা তোলার জন্য এটিএমের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারেননি— নিরুপায় হয়ে এদিন লাইনে দাঁড়িয়েছেন অন্যান্যদের সঙ্গে। অন্যান্যদের মতোই নীরবে ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, এই নির্দেশ জারি না হলে, আর ক'দিন বাদেই চিন বা পাকিস্তানের বোমা আক্রমণের মুখে আসল যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। কিংবা জঙ্গি তাণ্ডব এমন বাড়াবাড়ি রূপ ধারণ করত যা থামাতে সেনা নামানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হত। আর পুরোটাই স্পনসর হত ভারতীয় 'কালাধন'-এ। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ঠায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধের স্বগতোক্তি, মরবার আগে অন্তত দেখে যেতে পারলাম, ঠিক হোক ভুল হোক

ক্যাশ টাকার সৃষ্টি হয় প্রথমে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীর কাছেই। তোলাবাজ বা দালাল মারফত তার একটা অংশ পৌঁছে যায় নেতাদের হাতে, যা যোগফল করলে বেশ বড় অঙ্কে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই অঙ্কের একটা অংশ ব্যবহৃত হয় লোক পোষার জন্য, অপরাধ জগতে যাদের নিত্য আনাগোনা।

দেশের নেতারা কেউ সত্যিই এমন সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন!

সাধারণত একজন কৃষিজীবী বা ব্যবসায়ীর ঘরে ক্যাশ টাকা গচ্ছিত থাকতে পারে এক থেকে পাঁচ, একজন মাঝারি ডাক্তার বা উকিল কিংবা পুলিশ বা ট্যাক্স অফিসারের ঘরে সেই পরিমাণ হতে পারে ‘এনিথিং বিটুইন’ পনেরো থেকে তিরিশ, আর একজন রাজনৈতিক নেতার কাছে সেই পরিমাণ দাঁড়াতে পারে পঞ্চাশ থেকে সত্তর-আশি। এমনটাই ব্যাখ্যা করলেন ডুয়ার্স এলাকায় দীর্ঘদিন কর্মসূত্রে কাটানো সিনিয়র পুলিশ কর্তা। উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলায় ক্যাশ টাকার আন্দাজ এরকমই, তবে কোনও নার্সিংহোমওয়ালা সার্জেন বা একজন শহুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে এক-দু’কোটি ক্যাশ থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আসলে সবটাই যে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য তা নয়, তাঁর মতে কিছুটা অভ্যেস বা ব্যক্তিগত তৃপ্তিও কাজ করে এর পিছনে। সেই পুলিশ কর্তার মতে, গাঁজা-সুপুরি চোরাপাচারের স্বর্গরাজ্য এখন এই তিন জেলা। সেই সঙ্গে সোনা, নকল নোট, নারী পাচার, অস্ত্র এসব তো আছেই। এই সেক্টরে কাজ করে কোটি কোটি টাকার ক্যাশ— যার সঠিক আন্দাজ করা মুশকিল। গোয়েন্দা বিভাগের সেই অফিসারের ব্যাখ্যা, ক্যাশ টাকার সৃষ্টি হয় প্রথমে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীর কাছেই। তোলাবাজ বা দালাল মারফত তার একটা অংশ পৌঁছে যায় নেতাদের হাতে, যা যোগফল করলে বেশ বড় অঙ্কে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই অঙ্কের একটা অংশ ব্যবহৃত হয় লোক পোষার জন্য, অপরাধ জগতে যাদের নিত্য আনাগোনা। তাদের মাধ্যমেই ভুটান-বাংলাদেশ সীমান্তের ওপার থেকে আসা অপরাধীরা এপাশে বয়ে আনে অস্ত্র, বিস্ফোরক, সোনা ও নকল নোট— সেই ক্যাশ টাকার বিনিময়েই। আমাদের দেশের টাকাতেই ফুলে ফেঁপে মজবুত হয় বাইরের উগ্রপন্থী মৌলবাদী সংগঠনগুলি।

এর আগে আরেক গোয়েন্দা অফিসারের কাছে শুনেছিলাম, আসাম ও উত্তরবঙ্গের নানা জেলা থেকে বহু গ্রামীণ যুবক বাইরের রাজ্যে যায় ঠিকা শ্রমিকের কাজের জন্য— নেপাল-ভুটানেও তাদের যাতায়াত অব্যাহত এবং এদের মাধ্যমেই পাচার হয় বা ছড়িয়ে পড়ে নকল নোট। অথচ আপনার পাশের বাড়িটির যে ছেলেটি দুটো অতিরিক্ত রোজগারের লোভে এই কাজ করছে সে জানেও না এতে সে তার দেশের সার্বভৌমত্ব কতটা বিপন্ন করে তুলছে। সেই অফিসারই এবার নিজে ফোন করে জানিয়েছিলেন, এবার নাকি সাড়ে সর্বনাশ হল উত্তরবঙ্গের নকল নোট ব্যাপারীদের। সদ্য পুজো-দিওয়ালি ছুটি কাটিয়ে কাজে ফিরে গেছে সবাই— এ সময় নোট বাতিল ‘মাথায় আচমকা লোহার ডান্ডা’ পড়বার মতোই নাকি ব্যাপার হয়েছে— ওপারেও যেমন আগাম টাকা দেওয়া হয়ে গেছে— এপারেও তেমনই ফেরত আসার কোনও সম্ভাবনাই রইল না।

তবে সবাই যে যার মতো করে লড়ছে। এত সাধের টাকা জলে ভাসিয়ে দিতে বা পুড়িয়ে ফেলতে মায়া হয় সবারই। সোনা কেনার ফর্মুলা খুব একটা কাজে না লাগলেও, রাতারাতি নেপাল বা ভুটানে পাঠিয়ে সেদেশের নোটে পরিবর্তন করার কৌশল চলেছে কিছুদিন। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ শতাংশ ছাড় দিয়ে কালোকে সাদা করার রাস্তাতেও হেঁটেছেন অনেকেই। পুলিশের মতে, এতে

অবশ্য আখেরে লাভবান হয়েছে সরকার।

খুব স্বাভাবিক কারণেই বেজায় চটেছেন কিছু নেতা। এমনিতেই দিনভর শত ব্যস্ততা, তারপর এইসব পুরনো নোটের হিল্লে করা কি মুখের কথা? অথচ দেখুন, নোটের বান্ডিল ছাড়া রাজনীতিতে গদি টিকিয়ে রাখা কতটা কঠিন সেকথা সবাই জানেন, মায় নরেন্দ্র মোদিও। তবে অনেকেরই নাকি বহু 'হিসেব' মুখে মুখে থাকে— 'ভার্চুয়াল মানি'র মতোই সেসব 'লেনদেন' কেবল প্রয়োজনের সময়েই হয়। সুতরাং সেসব ক্ষেত্রে 'হার্ডক্যাশ' নিয়ে বিব্রত হওয়ার কারণ থাকে না। এই তথ্য দিলেন রাজনীতি জগতেরই 'অধুনা পিছিয়ে পড়া' এক নেতা। তবে তাঁর মতে, এসব 'ভার্চুয়াল' লেনদেন একটু বড় মাপের নেতাদের ক্ষেত্রেই হয়। অতএব কোনও নেতা বা মন্ত্রী প্রচুর কামাচ্ছেন শুনে এরকম ভাবার কোনও কারণ নেই যে, তাঁর বাড়িতে গচ্ছিত আছে ঘরভর্তি পাঁচশো হাজারের নোট! অনেকটা সেরকমই, সম্মতির মুচকি হেসেছেন সেই বঞ্চিত নেতা।

ডুয়ার্সের পর্যটন মরশুম তো সমাগত। শীতের ডুয়ার্স মানেই তো পরিযায়ীদের ভীড়। এবার কি সে ব্যবসা আদৌ হবে? খুবই চিন্তিত ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। বছরের ক'টা দিন তো ব্যবসা, তাও তো এবার লাটে ওঠার উপক্রম— এমনটাই আশঙ্কা করছেন তারা।

নোট বাতিল তো বুঝলাম, কিন্তু নতুন নোটের আমদানি না হলে দোকানদারি যে বন্ধ করে দিতে হবে! মুদি দোকানির আতঙ্কিত প্রশ্নের সহজ উত্তর দিলেন উপস্থিত জনৈক পরিচিত চিকিৎসক, কেন ভাই, ব্যাঙ্কে কার্ড সোয়াইপ করার যন্ত্রের জন্য এখুনি অ্যাপ্লাই করো। সবার কাছেই এখন ডেবিট কার্ড, কারও কোনও অসুবিধে হওয়ার কারণ নেই। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, আমিও আমার দুটো ব্যাঙ্কেই ওই মেশিনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি।

কিন্তু মেশিন আসার তো দেরি আছে, ডুয়ার্সের পর্যটন মরশুম তো সমাগত। শীতের ডুয়ার্স মানেই তো পরিযায়ীদের ভীড়। এবার কি সে ব্যবসা আদৌ হবে? খুবই চিন্তিত ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। বছরের ক'টা দিন তো ব্যবসা, তাও তো এবার লাটে ওঠার উপক্রম— এমনটাই আশঙ্কা করছেন তারা। ট্রেনের টিকিট, হোটেল খরচ ইত্যাদি না হয় অনলাইন হল, কিন্তু সাইট সিইং, খানাপিনা বা জঙ্গল সাফারির জন্য দরকার ক্যাশ— সেখানে তো আর কার্ড পেমেন্ট এখনও চালু হয়নি!

তবু আশায় বুক বেঁধে আছেন কিছু মানুষ— আমরা চেষ্টা করছি ক্যাশ যেটুকু দরকার তা ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে অগ্রিম নেওয়ার। যেহেতু ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাঙ্কে পুরনো নোট জমা দেওয়া চলবে, তাই আশা করছি বড়দিনের ছুটির ভিড়টাকে হয়ত সামলে দেওয়া যাবে। কলকাতার এক বন্ধু প্রায় বারো-তেরোজনের দল নিয়ে ২৩ ডিসেম্বর পৌঁছচ্ছেন ডুয়ার্সে। তিনি জানালেন, ট্যুর অপারেটর তাঁকে অনুরোধ করেছেন গাড়িভাড়া, খাওয়াদাওয়া বাবদ টাকাটা পৌঁছেই দিয়ে দিতে। বলাই বাহুল্য, সেখানে পুরনো নোটে খরচা মেটানোর সুযোগ থাকছেই। আর বনদপ্তর যদি সাফারির জন্য 'কার্ড পেমেন্ট' বা অগ্রিম 'অনলাইন পেমেন্ট' চালু করে দেন তো সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশের বেশ কিছু ন্যাশনাল পার্কে সাফারির অগ্রিম বুকিং অনলাইনে চালু হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন হল।

শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেশ জমে উঠেছে কোচবিহারের রাসমেলা। পাঁশকুড়ার চপ, কিংবা ভাপা পিঠের দোকানে দশ-কুড়ি-পঞ্চাশের নোট চলছে, বড় নোটের দেখা নেই ঠিকই, কিন্তু ফ্রায়েড চিকেনের দোকানে পাঁচশোর পুরনো নোটে আপত্তি করা হচ্ছে না। আর বড় দোকানগুলিতে রমরমিয়ে চলছে বাতিল হয়ে যাওয়া নোট। আইনের চোখে বাতিল হওয়া নোটে লেনদেন অপরাধ ঠিকই, কিন্তু মিয়া বিবি রাজি থাকলে কাজির আর কীই বা করার থাকে?'অপরাধের মার্জ্জনা মিলতেই পারে। কারণ শেষমেশ সবই যাবে ব্যাঙ্কে। ইতিমধ্যে বিকিকিনি চালু থাকুক, মানুষ যতটা পারে পুরনো টাকা খরচা করুক। মেলার আনন্দ বহাল থাকুক, আখেরে দেশের তো ক্ষতি হচ্ছে না!'

পুরনো-নতুন মিলিয়ে যা হোক করে এবছরটা না হয় পার করে দেওয়া গেল। কিন্তু পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হতে পারে নতুন বছর পড়লে। তখনও নতুন নোটের আকাল একই রকম থাকলে মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়তে পারে। কারণ দীর্ঘ দিন ধরে শান্তি আর ভর্তুকির স্নেহচ্ছায়ায় থেকে আমাদের সবার অভ্যেস বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে, সহ্যের সীমা তাই খুব বেশি দূর যায় না। আর তাতে ইন্ধন যোগানোর জন্য লোকের অভাব হবে না, সেটাও জানেন নরেন্দ্রভাই মোদি। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর বস্ত্রহরণের প্রচেষ্টা যে ভীষণভাবে জারি আছে দেশ জুড়ে, এটাও কারও অজানা নয়। যা কিছু করছেন তা পুরোটাই দল-রাজনীতির উর্দ্ধে সাধারণ মানুষের স্বার্থে, এই সত্য প্রমাণ করতে হবে তাঁকেই। তাই এত সব সত্ত্বেও শেষবেলায় সবার মুখেই একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন রয়ে গেল, শেষমেশ সব ঠিকঠাক থাকবে তো?

উত্তরায়ণ সমাজদার

কেবল মাফিয়ারাই নয় কালো টাকার স্রষ্টা ডাক্তার-মোক্তার-শিক্ষক-সাধারণ মানুষও

আকাশে যখন মেঘ সূর্যকে ঢেকে দেয় তার ছায়া শুধু এক জায়গায় পড়ে না। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমার ভ্রূকুটি তো মেঘের ছায়া মেনে চলে না। দিল্লিতে কালো টাকা উদ্ধারে প্রধানমন্ত্রী ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটের বাতিলের এই আচমকা ঘোষণা সারা দেশের মানুষকে যে ভাবে হতচকিত করে যুগপৎ চিন্তার কালো ছায়া এবং সাহসিক ভাবনার ছায়া-আলোর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে উত্তরবঙ্গও তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

মুশকিলটা হচ্ছে অন্যখানে। এই আলো আধারের খেলায় যে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে তাকে নিয়ে। কারণ নিজের ডানহাতটাকে যদি হঠাৎ বাঁ হাত বলে মনে হয় আর বাম হাতটা যদি এমনি ভাবেই আচমকা ডান হাত বলে মনে হয় তখন যেমন নিজেরই একেবারে অচেনা বলে মনে হয়, তেমনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই আচমকা ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটের বাতিল ঘোষণায় দেশের চেনা রাজনীতিবিদ্‌দের প্রতিক্রিয়া দেখেও এমনই মনে হওয়া স্বাভাবিক। প্রচলিত ভাষায় যাদের বানিয়া অর্থাৎ পাইকারি ব্যবসায়ী, মজুতদার ইত্যাদির দল বলে শ্রেণি চরিত্রের বিশ্লেষণের দল বলে বিজেপি-কে শুধু দক্ষিণপন্থী দলই নয় চড়ম দক্ষিণপন্থী-

দূরবিন

হিন্দুত্ববাদী দল বলে চিহ্নিত হলেও সেই দলের প্রধানমন্ত্রী কাউকে কিছু টের পেতে না দিয়ে হঠাৎই বড় নোট বাতিল ঘোষণা করে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে হয় সেগুলি অ্যাকাউন্টে জমা অথবা নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিচয় পত্রসহ পরিবর্তনের ঘোষণা করে দিয়ে সেই বাম রাজনৈতিক দলগুলির মতন যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতন হাজির হলেন। এমন কি তার দলেরই বানিয়া সমর্থকরা বিজেপির এই ঘোষণায় 'দু-নম্বরী' খাতার হত্যার আশঙ্কায় এর বিরোধীতায় রাস্তায় নেমে পড়ল।

কালো টাকা উদ্ধারে বড় নোটের বাতিলের দাবিটি কিন্তু ছিল এক সময়ে বামপন্থী দলগুলিরই। তাদের বিশ্বাস দেশের কালোবাজারি, মুনাফাখোর, মজুতদার তাদের বিশাল আয়ের এক বিশাল অংশ বড় নোটে গোপনে সরিয়ে রাখে। যেমনভাবে একদিন 'কাস্তেটাকে শান' দেওয়ার গান গেয়ে 'লাঙল যার জমি তার' দাবিতে একচেটিয়া পুঁজি ও জোতদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের হাতে তার মালিকানা তুলে দেবার দাবি করতেন। তারাই আবার একচেটিয়া পুঁজির কুলপতি টাটাদের হাতে কৃষিজমি তুলে দিতে সিঙ্গুরে কৃষকের জমি কেড়ে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। অপর দিকে যে রাজনৈতিক দলটি বৃহৎ জমিদার ও শিল্পপতির স্বার্থে সেবাদাস বলে দক্ষিণপন্থী দল বলে চিহ্নিত একটি রাজনৈতিক দলের দলছুট সংগঠন, সেই দলটিই যখন বামদলগুলির সেই পরিচিত স্লোগানটি হাতিয়ার করে ২৬ দিনের অনশন মঞ্চে বসে তখন যে কোন দল বাম আর কোন দল ডান সেটা চিনতে খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে।

বড় নোটের বাতিলের দাবি ছিল বামদের

সব যেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। সেই 'বদলে গেল মতটা থাকল পড়ে পথটা' যেন রাতারাতি বদলে গেল পথটা থাকল পড়ে মতটার মতোন যে ভাবনাটা ছিল বামদের এখন তারা ডানদের মতোন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বামপন্থীরাই এক সময় দাবি তুলত কালো

টাকার উদ্ধারে বড় নোট বাতিল করতে হবে। বানিয়া তথা বৃহৎ পাইকারি ব্যবসায়ী দল বলেই পরিচয় ছিল বিজেপি-র। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এদের গদি ব্যবসায় এসে জমা হয় মুনাফার গোপন টাকা। বিজেপি এদের স্বার্থরক্ষার দল। আজ যখন ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণায় এই শ্রেণির ব্যবসায়ীরাই সবচেয়ে বেশি মুশকিলে পড়বে, তখন বামরা তাদের সেই পুরনো দাবী থেকে সরে এলেন।

একটা কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই, কালো টাকার সিংহভাগই বৃহৎ কিছু মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের নানা ধরনের গোপন ভাণ্ডারে জমা থাকে। তবে সাধারণ বহু মানুষও কিন্তু এই কালো টাকার জন্ম দিয়ে চলেছে। সব চিকিৎসক না হলেও অধিকাংশ চিকিৎসক রোগীদের কাছ থেকে যে ফিস্ নেন তার জন্য রোগীকে রসিদ দেওয়ার কথা থাকলেও তারা যে তা দেন না এটা তো গোপন তথ্য নয়। এভাবে তাদের উপার্জিত অর্থ আয়কর দপ্তরে আয়কর রিটার্ন যে দেওয়া হয় না সে কথাও কিন্তু সত্যি। তারা তো এই অর্থ জলে ভাসিয়ে দিয়ে পূণ্য অর্জন করেন না। সেগুলির এক বিরাট অংশ বড় নোটের ভাণ্ডারে যে রেখে দেওয়া হয় সেটাও তো কালো টাকা।

আজকের শিক্ষকরা সেদিনকার বুনো রামনাথের মতোন তেঁতুল পাতার সেদ্ধ জল দিয়ে দু' মুঠো ভাত খেয়ে স্কুলে ও কলেজে মানুষ গড়ার কারিগর বানাতে জীবন কাটান না। সরকার এখন তুলনামূলকভাবে তাদের ভালই বেতন দেয়। তবু বাড়িতে ঘর ভরতি ছাত্রের প্রাইভেট টিউশানির ব্যবসা রমরমিয়ে চালান হয়। তা চালান, কিন্তু সেই সব প্রাইভেট ছাত্রদের কাছ থেকে তারা যে টিউশানির মাধ্যমে আয় করেন তার প্রায় কোনওটাই আয়কর রিটার্নে যে জমা পড়ে না তাকে অস্বীকার করার জায়গা নেই। সেটাও তো কালো টাকা। হয়ত তার এক বৃহৎ অংশ স্ত্রীর সোনার গয়নায় সুরক্ষিত রাখেন, তবু সেই কালো টাকার এক বড় অংশ বড় নোটে গোপন ভাণ্ডারে সঞ্চয় করেন।

আদালতে যারা শপথ বাক্য পাঠ করে আইনের যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে মক্কেলের মামলা লড়তে মক্কেলের কাছ থেকে ফিস্ নেন সবাই যে ফিসের সবটাই তাদের আয়করের রিটার্নে দেখান এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। সেই কালো টাকাও তো বড় নোটে জমা থাকে তাদের গোপন ভাণ্ডারে। বড় নোট বাতি হলে তো তাদেরই হবে গভীর সমস্যা। সেই কালো টাকাকে সাদা করতে যে প্রয়োজন হবে ব্যাঙ্কে জমা রেখে আয়কর দপ্তরে ফাইন দিয়েও আয়কর মেটানোর।

উত্তরবঙ্গে এই নোট বাতিলের প্রভাব

সারা দেশের আকাশে যে মেঘ তার থেকে উত্তরবঙ্গের আকাশ মুক্ত থাকবে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্সের কিছু এলাকার চা-শিল্পকে বাদ দিলে এখানে কোনও শিল্পের অস্তিত্ব নেই। এই ভূখন্ডের রাজধানী বলে কথিত শিলিগুড়ির অর্থনীতি বলতে 'বানিয়া অর্থনীতি' বা ফ্লোটিং ট্রেড। এখানে গড়ে উঠেছে পাইকারি বাজারের পাশাপাশি ফাটকা বাজার এবং তা ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র। এরই সঙ্গে প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বিশাল ল্যান্ড মাফিয়া লবি ও প্রমোটার রাজ। এদের লেনদেনের সিংহভাগই চলে আন্ডার টেবিল অর্থাৎ আয়করকে ফাঁকি দিতে নগদ অর্থে। প্রমোটার বা রিয়েল এস্টেট যা এখন

এখানকার প্রধান শিল্প রূপে রাজত্ব করছে সেখানে স্ট্যাম্প ডিউটি বাদে বাকি টাকা যে নগদে লেনদেন হয় তা অজানা নেই। ল্যান্ড মাফিয়াদের তো সেটুকুরও বালাই নেই। জমি বিক্রি বা কেনাতে তো বটেই এমন কী খাস জমিতে বসতি স্থাপন করতে যে কোটি টাকার প্রণামী আদায় করে তার তো কোনও হিসেবে দাখিল করার বাধ্যবাধকতা নেই। এই অর্থ যে এই ল্যান্ড মাফিয়ারা সিন্ডিকেটের সদস্যদেরই উদরকে স্ফীত করে তা তো নয়, এই অর্থ নির্দিষ্ট অনুপাতে রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের ঘরে নগদে চলে যায়। তারা তো এই অর্থের উৎস দেখাতে পারে না, তার তাগিদও নেই। সেই অর্থের অধিকাংশই জমা থাকে বড় নোটে গোপন ভাণ্ডারে। নোট বাতিল হওয়ায় সেখানে পড়েছে বিশাল আঘাত। তাই ফ্লোটিং ট্রেডে দেখা যাচ্ছে মন্দা।

নরেন্দ্র মোদি নোট বাতিল করেছেন। কিন্তু চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য চা-কোম্পানিগুলি মজুরি দেয় তা তো কালো টাকার ধাঁধার মধ্যে পড়ে না। চা-বাগিচা মালিকরা হিসেব কারচুপিতে মুনাফার এক বড় অংশ আয়কর ফাঁকি দিতে সরিয়ে রাখে। সেটা উদ্ধারে তো এভাবে নোট বাতিল করা যাবে না। কিন্তু শ্রমিকদের বেতন তো দেওয়া হয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অর্থ তুলে নির্দিষ্ট পরিমাণে। থাকে তার রেকর্ড। এই শ্রমিকদের ঘরে তো হিসেব বহির্ভূত কালো টাকার মজুত থাকে না। তাদের মজুরি মেটাতে নির্দিষ্ট ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে দিতে কোনও ভাবেই আপত্তি থাকার কথা নয়। বিয়ের খরচ মেটাবার জন্য টাকা তোলার অনুমতি দেওয়ার থেকেও শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মজুরির অর্থ জোগান দেওয়া সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। সেখানে এই নোট বাতিল এবং ব্যাঙ্ক থেকে বাগানকে প্রয়োজনীয় অর্থ না দিয়ে বিপুল সংখ্যক অক্ষরহীন শ্রমিকদের সামান্যতম সুযোগ না দিয়ে তাদের ইলেকট্রনিক ট্রানজ্যাকশনের মাধ্যমে মজুরির কথা বলা হয় তবে তো তা ফরাসি রানির সেই উক্তি, রুটি পাচ্ছে না তো কেক খেতে পারে-এর মতোন মনে হতে পারে।

নোট বাতিলের ফলে দরিদ্র মানুষের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে বলে যা বলা হচ্ছে, তাকে মানতে অসুবিধ আছে। ভারতের ৩৩ শতাংশ মানুষ তো এখনও দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। অর্থাৎ দৈনিক রোজগার ৪০ টাকারও কম তাদের ঘরে তো ৫০০ বা ১০০০ টাকা লুকিয়ে রাখার কোনও সম্ভাবনা নেই। সাধারণ কৃষক ফসলের দাম পায় না। মুনাফা লুটে নেয় আড়তদারেরা। সাধারণ কৃষকের ঘরে ৫০০ বা ১০০০ টাকার নোট লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যারা চাকুরিজীবি তাদের অধিকাংশেরই বেতন হয় অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তাদের প্রায় সবারই আছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। আয়কর কাটা হয় তাদের বেতনের উৎসমূল থেকে। তাই তাদের বাড়িতে যদি কিছু বাতিল নোট থাকে তাতে তাদেরও ব্যাঙ্কে জমা দিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেবার যে লম্বা লাইন তাদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে এই সব লাইনে দাঁড়ানো লোকেরা ১০ থেকে ১৩ শতাংশ কমিশনের বিনিময়ে অন্যের টাকা বদলাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

নোট বাতিলের তীব্র প্রভাব উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের উপর তেমনভাবে না পড়লেও ব্যবসায়ী মহলে যে একটা আতঙ্ক ও অনিশ্চিয়তার পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়েছে সেটা সত্যি। দেখা যাক এর প্রভাব কতখানি সুদূর প্রসারী হবে। তার জন্য আরও কিছুটা সময় দরকার।

সৌমেন নাগ

বাগানে স্থায়ী শ্রমিকের অভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে বাংলাদেশী শস্তার শ্রমিকদের ?

উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিল্প চা-বাগিচা শিল্প। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় এই চা-বাগিচা শিল্পে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিক শোষণ, সরকারি উদাসীনতা, টি বোর্ডের পরিচালননীতির ব্যর্থতায়, তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভুল নীতি এবং আন্দোলনবিমুখতায়, নেতাদের স্বজনপোষণ কার্যকলাপে আর্থ-সামাজিক সংকটে জর্জরিত চা-বাগিচা শিল্প। এই নিয়েই সমস্যা, সংকট, উত্তরণের দিশা ধারাবাহিকভাবে ‘এখন ডুয়ার্স’-এর কলামে। তুলে ধরছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। আজ **পঞ্চম পর্ব**।

‘অনাহারে নাহি খেদ, বেশি খেলে বাড়ে মেদ’— ‘হীরক রাজার দেশে’র এই স্যাটায়ার উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচার মৃত্তিকায় কতটা যে বাস্তবোচিত তা চা শিল্প সংশ্লিষ্ট সকলেই কমবেশি বোঝেন। অনাহারে মৃত্যুর খবর কি ক্ষমতালিপ্ত সরকার বা শাসকদল স্বীকার করতে চায়? আর তাই আমাদের কাছে বাগিচা কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট দেন, মৃত্যুর কারণ অনাহার নয়, মরেছে পিলেরোগে অথবা লিভার অথবা ফুসফুস বা হার্টের দোষে। ধুমচিপাড়া, মুজনাই, রেড ব্যাঙ্ক, বাগরাকোট, মেটেলির নাগেশ্বরী, ঢেকলাপাড়া, রায়মাটাং, রামঝোরা, কাঁঠালগুড়ি চা-বাগিচার মৃত্যুমিছিল শুধুমাত্র তৃণমূল সরকারের রাজত্বকালে নয়, এর সূচনা বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বকাল থেকেই। ক্যারন চা-বাগানের ম্যানেজার প্রিয়ব্রত ভদ্রর সঙ্গে মতবিনিময় হচ্ছিল ম্যানেজার’স বাংলোয় বসে। প্রিয়ব্রতর কাছে বাগানগুলির পরিচালনব্যবস্থার এক বিস্ময়কর ছবি পেলাম। দীর্ঘদিন ধরেই ডানকান অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের মতো বৃহৎ কোম্পানির মালিকানাধীন প্রায় ১২টি চা-বাগিচায় তীব্র শ্রমিক সংকট। অঘোষিত বন্ধের কারণে অধিকাংশ বাগান শ্রমিক, বাবু তথা ম্যানেজারিয়াল স্টাফ দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকেন। কোনও সময়ে সাময়িক অচলাবস্থা কেটে গিয়ে বাগান খোলে, কোনও সময়ে আবার চা-পাতির মিষ্টি সোঁদা গন্ধ উবে গিয়ে কীটনাশকের গা ঝিমঝিম করা গন্ধ মাখা বাগানে শুধুই নিস্তব্ধতা। প্রিয়ব্রত বলে, ‘জানো, শ্রমিকদের মজুরি থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ টাকা কাটা হলেও সেই টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা পড়ে না, এবং মজার কথা হল, এই শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য তারা কোনও শাস্তি পায় না।’ আমি প্রশ্ন করি, ‘এদের কোনও শাস্তি হয় না?’ ‘শাস্তি!’ অবাক হয় ক্যারনের ম্যানেজার ভদ্র সাহেব। ‘লিজ করা জমি নবীকরণ বাধ্যতামূলক হলেও বহু চা-বাগানের মালিক এই নবীকরণ না করে বছরের পর বছর বাগান চালিয়ে যাচ্ছে।’ প্রিয়ব্রত অবশ্য

আমাকে আলাপচালিতার আগেই বলেছিল, ম্যানেজার হিসেবে নয়, নাগরিক হিসেবেই সে তার মতামত জানাবে।

ডুয়ার্সের চা-বাগিচার পরিস্থিতি ডুয়ার্সের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপর থেকেই প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু চা-বাগিচাগুলিতে দীর্ঘদিন জড়িয়ে থাকা শ্রমিক-কর্মচারীরা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করেন। রাজনীতি বা ট্রেড ইউনিয়ন করা মানুষজন চা-বাগিচার পরিস্থিতিকে জানেন রাজনৈতিক স্বার্থেই। বান্দাপানি চা-বাগানে চৈত্র-বৈশাখ মাসে জলের একমাত্র ভরসা ডলোমাইটে ভরা ৬ কিলোমিটার দূরের পাহাড়ি ঝোরা। অন্ত্যোদয় অন্নপূর্ণা যোজনায় সপ্তাহে শ্রমিকপিছু আধ কিলো গম, এক কিলো চাল, ১০০ গ্রাম চিনি আর ১০০ গ্রাম কেরোসিন তেল পেতে খরচ হয় আট টাকা। ২০১৫-এর ১৬ মে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগান পরিদর্শনের পরে ১৭ মে শিলিগুড়িতে যখন বৈঠকে বসেন, তখন সেই বৈঠকেই শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালু করতে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হতে বলেন। বাগান বাঁচানোর স্বার্থে প্রতিটি জেলায় মনিটরিং কমিটি গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন। তবুও অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি তো হয়ইনি, বরং উত্তরোত্তর আরও অবনতি হয়েছে।

প্রিয়ব্রতর মতে, চাযের স্বাদ ও গন্ধের অনুপাত নির্ভর করে স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশের উপর। এই চা-বাগিচাকে কাজে লাগিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করার লক্ষ্যে প্রয়োজন নিরন্তর গবেষণা। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধির হারকে আরও বাড়াবার জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা। প্রয়োজন বায়োটেকনোলজি এবং আধুনিক কৃষি গবেষণার উপর জোর দেওয়া। পুরনো চা গাছের পরিবর্তে নতুন চারাগাছ রোপণ করার কাজও বিশ বাঁও জলে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা করার ফাঁকেই আলিপুরদুয়ারে হঠাৎই পেলাম সৌরভ চক্রবর্তীকে। অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর সামান্য সময় দিলেন তিনি। শর্ত একটাই, একটিমাত্র প্রশ্নেরই উত্তর দেবেন। অনেক চিন্তা করে প্রশ্ন করলাম, বর্তমান সরকারের দানখয়রাতির নীতি কি অবশেষে বন্ধ চা-বাগিচায় প্রয়োগ করতে চলেছেন পাকাপাকিভাবে? প্রশ্নের রাজনৈতিক ঝাঁজটা বুঝতে ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ সৌরভের একটুও সময় লাগল না। তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দিয়ে বললেন, চা-বাগিচা চালু রেখে

বাগানের কাজে অনুপস্থিত স্থায়ী শ্রমিকদের বদলে লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজে লাগানো হচ্ছে বাংলাদেশি শ্রমিকদের। ওই শ্রমিকদেরকে দিয়ে পাতা তোলানোর কাজ করা হয় না। মূলত ফ্যাক্টরিতে অপেক্ষাকৃত খাটুনির কাজে দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ শেষে মজুরি মেলে ১৭০ টাকা।

সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। চা-বাগিচার সমস্যা মেটাতে গেলে চা-বাগিচা শ্রম আইনের আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন, না হলে রাজ্য সরকারের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে। দানখয়রাতির প্রশ্নের উত্তরে সৌরভের যুক্তি, চা-বাগিচার শ্রমিকরা যখন কাজ হারিয়ে দিনের পর দিন খেতে পায় না, তখন মানবিকতার খাতিরে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প অথবা অন্ত্যোদয় যোজনা জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করতেই হয়। রাজ্য সরকার শুধুমাত্র রেশনিং-এর ব্যবস্থাই করেনি, কেন্দ্রকে বারংবার চা-বাগিচা শ্রম আইন সংশোধনের জন্য চাপ দিচ্ছে। সৌরভ জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসেবে বন্ধ এবং রুগ্‌ণ বাগিচা মালিকদের আর্থিক ক্ষতির দিকটিও বিবেচনা করছেন বলে জানালেন।

২০১৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন কালচিনি ব্লকের মধু চা-বাগিচার শ্রমিকরা যখন দুর্গা পূজার বোনাসের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, আগমনির আবাহনের প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই হাজারখানেক শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আশায় জল ঢেলে বাগান বন্ধ করে দিয়ে চলে যান বাগান কর্তৃপক্ষ। পুজোর বোনাসকে কেন্দ্র করে শ্রমিক অসন্তোষের অজুহাত দেখিয়ে সে দিন তাঁরা বাগান ছেড়েছিলেন। তারপর কেটে গিয়েছে দুটো বছর। বাগান খোলেনি আজও। বাগান বন্ধ, কবে খুলবে জানা নেই কোনও শ্রমিকেরই। দু'বেলা খাওয়া জুটবে কি না অথবা জুটলেও সেই খাবারে পরিবারের সকলের পেট ভরবে কি না তা-ও জানা নেই। এটাই এখন তাদের প্রতিদিনের জীবনের মহামূলমন্ত্র। দীর্ঘদিন বাগান বন্ধ পড়ে থাকায় ঘরে ঘরে অনটন নিত্যসঙ্গী। শ্রমিকমহল্লায় নুন আনতে পানতা ফুরায় এমন অবস্থা। কথা হচ্ছিল মধু চা-বাগিচার বাসিন্দা পর্বত ছেত্রী, সীমা ওঁরাও, শুভন্তী খাড়িয়ার সঙ্গে। তাদের কাছ থেকে জানা গেল, কিছু শ্রমিক পাশের চা-বাগিচায় ঠিকা শ্রমিকের কাজ পেয়েছেন, অনেকে জয়গাঁ বা ভুটানে গিয়ে উপার্জন করছেন। বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা বয়সের ভারে জর্জরিত হবার ফলে অন্যত্র কাজে যেতে পারেন না। সাঁতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনোজ বড়ুয়ার তত্ত্বধানে রাজ্য সরকার শ্রমিকদের সুবিধার্থে বেশ কিছু প্রকল্প চালু করেছে বাগানে। এগুলির মধ্যে অন্ত্যোদয় যোজনা, সহায় প্রকল্পের কাজ সার্বিকভাবে চলছে। বীরপাড়ার সহকারী শ্রম আধিকারিকের কাছ থেকে পাওয়া সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্ধ মধু চা-বাগানের শ্রমিকরা ফাউলাই ভাতা হিসেবে মাসে দেড় হাজার টাকা করে অনুদান পাচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে কিছুটা হলেও খুশি বন্ধ মধু চা-বাগানের শ্রমিকরা।

প্রথাগত কিংবা পরম্পরা মেনে আদিবাসী এবং গোর্খা জনজাতির শ্রমিকরাই কাজ করে তরাই এবং ডুয়ার্সের চা-বাগিচাগুলিতে। ফলে অনেক বাগানেই পর্যাপ্ত শ্রমিক না থাকার ফলে ভুটানে চুক্তিতে নির্মাণকাজ করতে যাওয়া বাংলাদেশি শ্রমিকরা ভুটান থেকে ভারত হয়ে দেশে ফেরার সময় একটা বড় অংশ ঘাঁটি গেড়েছে ডুয়ার্সের বাগিচাগুলিতে। মূলত চা-বলয়ের বস্তি, গ্রামীণ এলাকা, এমনকি আধা শহর এলাকাতেও তারা বয়ে যাচ্ছে। অনেকেরই ভোটার কার্ড, র‍্যাশন কার্ডও হয়ে গিয়েছে নানা রাজনৈতিক শিবিরের হাত ধরে। ওইসব শ্রমিকের চা-চাযের ভরা মরশুমে ব্যাপক চাহিদা। এই শ্রমিকরা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। নাগরাকাটায় দেখা শুভজিতের সঙ্গে। শুভজিৎ দত্ত শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকার নাগরাকাটার প্রতিনিধি। শুভজিতের মতে, বাগানের কাজে অনুপস্থিত স্থায়ী শ্রমিকদের বদলে লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজে লাগানো হচ্ছে বাংলাদেশি শ্রমিকদের। ওই শ্রমিকদেরকে দিয়ে পাতা তোলানোর কাজ করা হয় না। মূলত ফ্যাক্টরিতে অপেক্ষাকৃত খাটুনির কাজে দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ শেষে মজুরি মেলে ১৭০ টাকা। যেসব বাগিচায় গ্রিন টি তৈরি হয়, সেইসব বাগানেই এদের চাহিদা বেশি। নগদ মজুরি ছাড়া পিএফ, গ্র্যাচুইটি, র‍্যাশন, আবাসন, চটিজুতো, ছাতা, ত্রিপল বা অন্য কোনও সুযোগ-সুবিধা দিতে হয় না বলে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশি শ্রমিকরা চা উৎপাদকদের কাছে কাঙ্ক্ষিত। ফালাকাটা, জয়গাঁ, ধূপগুড়ি সংলগ্ন একাধিক বাগানেই

এই শ্রমিকরা কাজ করছে।

চায়ের রমরমা দেখে আসাম-বাংলায় একসময়ে ছোট ছোট বাগিচা চাষ শুরু হয়েছিল। পথের ধারে ফ্যাক্টরি হল অজস্র। বহু ফ্যাক্টরি চা-পাতা কিনে চা বানাতে শুরু করল। মনোপলিস্টরা কম দামে চা কিনে নিতে শুরু করল। তারা পাতা কিনে চা বানাতে শুরু করল। ডুয়ার্স এবং তরাই অঞ্চলে পাতা-কেনা ফ্যাক্টরিগুলি অন্য বাগানের টি ওয়েস্ট কিনে চায়ের মধ্যে মেশাবার ফলে তাদের চা বানানোর খরচ আরও কমিয়ে ফেলতে পারল। প্যাকেটিয়ারস কোম্পানিগুলি নতুন ফ্যাক্টরির পাতা কিনে, নিলাম থেকে কিছু ভাল চা কিনে তা মিশিয়ে প্রায় দু'শো টাকা কেজি দরে বাজারে বিক্রি করে। বাগানওয়ালারা গড়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দাম পাচ্ছে গড়ে ৫০-৬০ টাকা। কিছু বাগান আরও কম। শতকরা ১০-২০টি বাগানের গড় অবশ্য ৭৫-১৫০ টাকা। তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায়, বিভিন্ন স্থানে হাতবদল হবার পর ক্রেতা ১০০ টাকা করে কেনে, সেখানে উৎপাদক লাভ পাচ্ছে মাত্র ৫০ টাকা বা তারও কম। তাই চা শিল্পে লোকসান বাড়ার ফলে বিপদ বাড়ছে শ্রমিকদের। রেশন, জল, মাইনে, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা— সবকিছু বন্ধ হচ্ছে। রুগ্‌ণ হবার ফলে অধিকাংশ বাগান এখন বন্ধ হয়ে যাবার পথে। চা শিল্প এখন শ্রমিকদের নয়, বিপণনকারীদের।

নিয়ম না মেনে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে লাল পোকা কিংবা লুপার ক্যাটারপিলারের তা সহ্য করার ক্ষমতা তৈরি করে দিয়েছে। তাই প্রচুর বৃষ্টি হলেও লাল পোকা এবং লুপার ক্যাটারপিলাররা মরছে না বলে ভুগতে হচ্ছে চাষিদের। সরকার অনুমোদিত এবং নির্ধারিত মাপে কীটনাশক ব্যবহার করলে চাষিরা উপকৃত হবেন।

শুধুমাত্র ডুয়ার্সে নয়, ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে বেরিয়ে পড়েছিলাম ইসলামপুর, চোপড়া, সোনাপুর এবং বিধাননগরে। বৃষ্টি ঠিকঠাক হলেও লাল পোকার আক্রমণে নাজেহাল ইসলামপুর, চোপড়া, গোয়ালপোখর, এমনকি তরাই এলাকার চা-বাগান কর্তৃপক্ষ। লাল পোকা, চা-মশা এবং লুপার ক্যাটারপিলারের উপদ্রবে চা-চাষিদের রাতের ঘুম উবে গিয়েছে। সাধারণত ভাল বৃষ্টিপাত হলে চা-বাগিচায় লাল পোকার আক্রমণ হয় না। কিন্তু এবারের রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাতের পরেও লাল পোকার বাড়বাড়ন্ত। পাশাপাশি বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় চা-মশা কচি চা-পাতার রস শুষে নিচ্ছে এবং লুপার ক্যাটারপিলার কচি পাতাকে খেয়ে নিচ্ছে বলে চা-বাগানে উৎপাদন মার খাচ্ছে। দেড় দশক আগেও উত্তরবঙ্গে চা-বাগান বলতে বড় বাগান বোঝাত। এইসব চা-বাগানে পাতা তোলা থেকে শুরু করে নিজেদের কারখানায় চা তৈরি করা হত। পরবর্তীকালে চা-পাতার চাহিদা বৃদ্ধি পাবার ফলে এবং বাজারে তেজি ভাব থাকার জন্য অনেকে তরাই এবং ডুয়ার্সব্যাপী ছোট ছোট চা-বাগান করা শুরু করে। এইসব বাগানের চা গাছগুলি থেকে শুধুমাত্র পাতা তোলা হয়। চা শিল্পে মন্দা ভাব দেখা দেওয়ার ফলে সংকটের মুখে পড়ে গিয়েছেন উত্তরের চা-চাষিরা। তাঁদের উৎপাদিত কাঁচা চা-পাতার দাম কিলোগ্রাম প্রতি অনেক কম দামে বিক্রি হবার ফলে উৎপাদনমূল্যের অর্ধেকের কম দামে পাতা বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকরা বিভিন্ন ফসলের চাষ করে সফল না হয়ে নিজেদের জমি সাম্প্রতিককালে বহু চা-চাষিকে বিক্রি করে দিয়েছেন।

কনফেডারেশন অব স্মল টি গ্রোয়ারস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর মতে, অতীতে ভাল বৃষ্টি হলে রোগ-পোকার আক্রমণ হত না। কিন্তু বর্তমানে যে কীটনাশকই ব্যবহার করা হোক না কেন, লাল পোকা ও লুপার ক্যাটারপিলার বাগান থেকে নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর মতে, এতদিন চাষিরা কীটনাশক ব্যবহারের বিধি জানতেন না। কিন্তু সম্প্রতি চা পর্ষদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে কীটনাশক ব্যবহারের তালিকা প্রকাশ করেছে। এখনই চাষিরা সতর্ক না হলে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে চা-বাগানগুলি। ভারী বর্ষণ এবং রোগ-পোকার আক্রমণে উত্তরের চা-বাগিচাগুলির ফলন অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য বছর লাল পোকা দেখা না গেলেও এবার ওই পোকার উপদ্রব বেড়েছে। ওই পোকাগুলিও চা-মশার মতো কচি পাতার রস খেয়ে নিচ্ছে। ফলে বাগানগুলির ফলন কমছে। ভারতীয় চা গবেষণাকেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডি. বরগোঁহাইয়ের মতে, চা-বাগানে নিয়ম না মেনে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে লাল পোকা কিংবা লুপার ক্যাটারপিলারের তা সহ্য করার ক্ষমতা তৈরি করে দিয়েছে। তাই প্রচুর বৃষ্টি হলেও লাল পোকা এবং লুপার ক্যাটারপিলাররা মরছে না বলে ভুগতে হচ্ছে চাষিদের। সরকার অনুমোদিত এবং নির্ধারিত মাপে কীটনাশক ব্যবহার করলে চাষিরা উপকৃত হবেন।

নিজেদের জমিতে চা চাষ করার ফলে গত ১৫ থেকে ২০ বছরে উত্তরবঙ্গে প্রায় সাতশো ছোট চা-বাগান তৈরি হয়েছে। সমগ্র উত্তরবঙ্গে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ ওইসব ক্ষুদ্র চা-বাগানের সঙ্গে জড়িত। কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করে তাঁদের জন্য সহায়ক মূল্য ধার্য করলেও এখানকার চাষিরা সেই ধরনের কোনও সাহায্যই পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। পাঁচ কেজি কাঁচা চা-পাতা থেকে এক কেজি খাবার চা তৈরি হয়। চাষিরা এক কেজি কাঁচা চা-পাতার দাম পান ১০-১২ টাকা। অথচ বাজারে চা বিক্রি হচ্ছে ১২০ থেকে ১৮০ টাকার মধ্যে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাগানের গুণগতমান অনুযায়ী কাঁচা চায়ের দাম আরও কম থাকে। তাই কাঁচা চা-পাতা এবং খাবার চায়ের দামের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখলে এই অঞ্চলের চা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপকার হবে।

বাগানের কাঁচা পাতা তুলে দূরের কোনও বাগানের ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাওয়ার রোজগার চিত্র দেখা যায় তরাই বা ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা-বাগানে। চারের দশক থেকে ক্লোজার, সাসপেনশন অব ওয়ার্ক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করছে আমাদের দেশের প্রচলিত আইন। সারা ভারতের চা-শ্রমিকদের আজ একসঙ্গে লড়াইয়ের গতিপ্রকৃতি ঠিক করতে হবে। ব্যবসায়ী এবং মনোপলিটদের রুখতে হবে। এ কাজে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সাহায্যের প্রয়োজন। ব্যবসাতে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন। আইনের কোনও ধারা বদলাতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বসতে হবে। কথায় কথায় নিলাম বন্ধের ষড়যন্ত্র রুখতে হবে। চায়ের মান বাড়ানার দিকে বাগান মালিক ও শিল্পমহলকে নজর দিতে হবে। গুণগতমানের চা রপ্তানি করতে হবে। চা শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ছোট বাগান এবং যে সমস্ত কারখানা চা-পাতা কিনে প্রক্রিয়াকরণের পর বিক্রি করে, তাদেরকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই সরকার, টি বোর্ড, শ্রম দপ্তরকে আর ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। সমস্যার সঠিক সমাধানের ক্ষেত্রে চটজলদি তৎপরতা প্রয়োজন। কারণ মুক্ত বাজার অর্থনীতির দাপটে আগামী দিনে শ্রমিকস্বার্থ সংকুচিত হবেই। সেই দুঃসময়ের দিনগুলিতে শ্রমিকদের পাশে না দাঁড়ালে উত্তরবঙ্গে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

(ক্রমশ)

কবিগুরুর শহর শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নানা অনুষঙ্গ। লাল পলাশ উপচে পড়া গাছেদের সারি আর নিস্তরঙ্গ খোয়াইকে সঙ্গে নিয়ে জেগে থাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়-শহর। বছরভর নানা উৎসব এসে রাঙিয়ে দিয়ে যায় শান্তিনিকেতনকে, তখন বাউলদের মন উদাস করা সুরে সুর মেলাতেই তার বেলা যে যায়।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal +91(033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

রেকর্ড মার্জিন তবু কিঞ্চিৎ ভ্রুকুঞ্চনের কারণ কিছু ঘটিল?

মাত্র ছ'মাসের ব্যবধানে এমন ভোল পালটানো নজির চট করে খুব একটা স্মরণে আসবে না মস্ত বড় কোনও রাজনীতিবিদ বা নেতারই। খুবই স্বাভাবিক যে এতে ভ্রু খানিক হলেও কোঁচকাবেই। তা না হলে প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও ভোটের ফলাফল পর্যালোচনা করার জন্য নেত্রীর সকাশে জরুরি তলব কেন জেলার নেতৃবৃন্দের? জয়ের মার্জিন এতটা বাড়লেও কেন নেতাদের মুখে সেই হাসি দেখা গেল না? কোচবিহার লোকসভা উপনির্বাচনের পর এইসব প্রশ্নই এখন হালকা তাড়া করে বেড়াচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহলকে।

বাজারে খবর ছিল। সাধারণ মানুষেরও হালকা আন্দাজ ছিল। আর আমরাও গত সংখ্যার পর্যালোচনায় খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। তা হল, কোচবিহারের উপনির্বাচনে এবার হাওয়া মোরগ যা আভাস দিচ্ছে, তাতে পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট অস্বাভাবিকভাবে বাড়বে। বিজেপি-র রাজ্যস্তরের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ কোচবিহারে ক্যাম্প করে কাটিয়েছেন, এসেছেন সেলেব্রিটি নেতা-নেত্রীরাও। অন্য দিকে, ওয়াকওভার গেম জেনেও কোথাও কোনওরকম ঢিলেমির অবকাশ রাখেনি তৃণমূল। প্রচার থেকে শুরু করে ভোটদান পর্ব সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত। প্রয়োজন ছিল না, তবুও জয় নিশ্চিত করার যাবতীয় 'কৌশল' ব্যবহৃত হয়েছে। পাছে পচা শামুকে পা কেটে যায়। বিরোধীরা একে যতই বলুক 'প্রহসন', 'পুরনো কায়দায় ভোট করার এই সুযোগ তো আসল নির্বাচনের সময় মেলে না।' আর এ কথা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই— জো জিতা ওহি সিকন্দর।

পচা শামুকে পা না কাটলেও কোচবিহারের ভোটের ফলাফল কিন্তু বিশ্লেষকদের মাথা কিঞ্চিৎ হলেও ঘুরিয়ে দিতে পেরেছে। প্রথমত, রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতোই এখানেও বাম বা কং-দল অবলুপ্তির পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে।

> এই বাংলায় লড়াই-প্রতিবাদ-বিরোধিতার রং এখন থেকে আর লাল নয়, গেরুয়া। মাত্র কয়েক মাসে এই ম্যাজিক পরিবর্তন দেখাল কোচবিহারের মানুষ তাদের অকাল নির্বাচনে। নিন্দুকের তির্যক মন্তব্য, 'বাংলার বিধি বাম' এই অপবাদ এবার বোধহয় ঘুচবে। এসবে আদৌ কি কোনও হেলদোল ঘটেছে ঘাসফুল শিবিরে?

তৃণমূল তাদের গলাধঃকরণের কাজ প্রায় সাঙ্গ করে নিয়ে এসেছে বলা যায়। তা না হলে ছ'মাস আগে যাদের প্রাপ্ত ভোট ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ, ছ'মাস বাদেই তা কমে দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ কুড়ি হাজার। যা সাধারণ মানুষের ভাষায়— জাস্ট ভাবা যায় না!

দ্বিতীয়ত, এই ছ'মাসে বিজেপি-র ভোট এক লক্ষ আশি হাজার থেকে এক লাফে তিন লক্ষ আশি হাজারে পৌঁছে গিয়েছে কোনও এক অদৃশ্য জাদুবলে। বামেদের যে চার লক্ষ তিরিশ হাজার ভোট এবার কমেছে, তার দু'লাখ গিয়েছে বিজেপি-র বাক্সে— মাত্র ১৮০ দিনের ব্যবধানে যা 'অভাবনীয়' বলেই ধারণা অভিজ্ঞ মহলের।

তৃতীয়ত, বাকি দু'লাখ তিরিশ হাজার ভোটের মধ্যে নিন্দুকের কথা অনুযায়ী যদি কিঞ্চিৎ জল আছে বলে ধরেও নেওয়া হয়, তবুও চোখ বুজে বলা যায়, এর প্রায় পুরোটাই সংখ্যালঘু ভোট। অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের পক্ষের ভোট তো জোড়াফুলে পড়েছেই, এবার বিরোধী সংখ্যালঘু ভোটও একটাও মাটিতে পড়েনি। সংখ্যালঘু ভোট দখলে আপাত সফল তৃণমূল, কিন্তু অন্য দিকে এতদিনের 'ধর্মনিরপেক্ষ' বাংলায় আগামী দিনের ভোট ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক হতে চলেছে, তার পরিষ্কার ইঙ্গিত মিলছে, যা বোধহয় কখনওই কাম্য ছিল না।

চতুর্থত, প্রাপ্ত ভোট অনেকটা বাড়লেও শহরাঞ্চলে 'শাসক বিরোধী' নেগেটিভ ভোটও এতদিনকার ধারা বদলে পদ্ম ফুলে যেতে শুরু করেছে। দিনহাটা ও মাথাভাঙা পুর এলাকার বেশ কিছু ওয়ার্ডে বিজেপি-র এগিয়ে থাকা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর কোচবিহার পুর এলাকায় যে তৃণমূলের ভোট কমছেই, সেই আগাম শঙ্কার কথা আমরা গত সংখ্যাতেই জানিয়েছিলাম। দীর্ঘ দিনের কংগ্রেসি চেয়ারম্যান বীরেন কুণ্ডু শেষ বেলায় তৃণমূলে যোগ দিলেও তাঁর অকালমৃত্যুতে পুরসভার উত্তরাধিকার পান তাঁর স্ত্রী ও পুত্র— স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের প্রশ্রয়েই। পরবর্তীকালে পুরসভার নানা দুর্নীতির খবরে এবং শহরের পরিচ্ছন্নতা ও নিকাশি ব্যবস্থার ক্রমাগত অবনতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সাধারণের মধ্যে পুঞ্জীভূত থাকা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে এবারের ভোটের বাক্সে। অথচ জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে তাঁদেরকেই দলের মুখ হিসেবে প্রচারে দেখা গিয়েছে, যা কার্যত বুমেরাং হয়েই ফিরেছে।

পঞ্চমত, চার লক্ষ বিরোধী ভোটের

অর্ধেক বিজেপি-র বাক্সে ঢোকা একেবারেই ‘স্বাভাবিক’ হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না তৃণমূলের উপরতলার নেতারা। কলকাতার দু’জন শীর্ষ সারির নেতার এ নিয়ে বক্তব্য একসঙ্গে করলে যা দাঁড়ায়— মাত্র ছ’মাস কেটেছে। এই ছ’মাসে কোথাও কোনওরকম বড় ‘ফাউল’ করেনি দল, বিরোধী শিবির এখনও কোথাও সমালোচনা বা আক্রমণের সুযোগ পায়নি। অথচ এর মধ্যে বিরোধী ভোটের নিঃশব্দ শিবির বদল এক কথায় ‘অস্বাভাবিক’। শাসকদল বিরোধী সচেতন মানুষের ব্যাখ্যা— উপরে প্রকাশ্যে না হলেও নিচের স্তরে চলছে ‘দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য’। উপরমহলের অকারণ তোষণ, তাঁদের মতে, এইসব দুর্নীতিপরায়ণকে দিনকে দিন আরও বেপরোয়া করে তুলছে, যা অনেক সময়ই ব্লক বা জেলাস্তরের নেতাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। রোজ চোখের সামনে এসব নীরবে সহ্য করতে করতে মানুষ চুপচাপ সরে যাচ্ছে অন্য দিকে। এই অভিযোগ অস্বীকার করে না তৃণমূল সমর্থকরা। তাদের কথায়, একসময়কার আগমার্কা বামপন্থীরা, যারা ঠিক সময় শিবির বদলে তৃণমূলে ঢুকতে পারেনি, তারাও এই সুযোগে আশ্রয় নিচ্ছে বিজেপি-র ছাতার নিচে— আজ হোক, কাল হোক, কামাই-ধান্দার সুযোগ এলে যাতে এগিয়ে থাকা যায় এই অভিলাষেই। আর তাদের পিছনেই নাকি লাইন দিয়ে আছে সেইসব ‘বঞ্চিত’ তৃণমূলি, যারা অস্তিত্বের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ে ‘আঙুল চুষছে’। অতএব আগামী নির্বাচনগুলিতে তৃণমূল বিরোধী ভোট কমবে না বরং বাড়বে— এটাও যেমন সত্যি কথা, তেমনই এই ভোট যে পদ্ম ফুলেই পড়বে— এটাও এই মুহূর্তে সহজেই অনুমান করা যায়।

এক সিনিয়র সাংবাদিক বন্ধু একবার বলেছিলেন, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখবে, বাম-আমলে কিছু আগাম অনুমান করা যতটা কঠিন ছিল, ততটাই সহজ এখনকার জমানায়। যদিও এখনও আগামীকাল কী হতে যাচ্ছে তা সঠিক বলার ক্ষমতা নেই কোনও নেতারই, কারণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে মাত্র একজনেরই। কিন্তু সেই নেতা তোমাকে নানা রকমের বিশ্লেষণে, এমনকি তা নিজের দলের বিরুদ্ধে হলেও ব্যাখ্যা করে দেবেন অবলীলায়। পঞ্চায়েত স্তরের সেরকমই এক নেতার মতে, নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণের মিটিং মানেই নেত্রী নেতাদের সবাইকেই কমবেশি বকাঝকা করবেন, হয়ত নতুন কোনও পর্যবেক্ষক বা কমিটি গঠন করে দেবেন। উপস্থিত নেতারা নিজেদের পিঠ এখনকার মতো বাঁচানোর জন্য কিছু উত্তর তৈরি করে নিয়ে যাবেন, তবে সেগুলি নিয়ে যে তাঁরা বলার সুযোগ পাবেন, তার কোনও মানে নেই। অসুখের মূল কারণ চিহ্নিত করে তার নিরাময়ের পথ নিয়ে আলোচনা করার তাগিদ হবে না উপস্থিত কোনও নেতারই। নেত্রীরও সময় খুব কম, স্বাভাবিকভাবেই এর পর তিনি অন্যত্র ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

তাই আজ যে ভ্রু কিঞ্চিৎ কুঁচকেছে, তার ভাঁজ আগামী দিনে হয়ত আরও লম্বা হবে। রাজনীতি যাঁদের ‘জীবিকা’, তাঁদের একটা অংশ শীঘ্রই শিবির বদল শুরু করলেন বলে। একটা অংশ তারপর ‘আপাত অবসর’ হিসেবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করবেন। বাকিদের মধ্যে শুরু হবে আসল বনাম নকলের সংঘাত। এভাবেই কোচবিহার উপনির্বাচনের ফলকে বাংলার আগাম নিদান হিসেবে মান্যতা দিতে চাইছেন পোড়খাওয়া রাজনীতিকরা, যাঁরা বয়সের ভারে আর নবীনদের ধারে মঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন নিজেদের, কিন্তু তাঁদের চেতনাকে জাগিয়ে রেখেছেন আজও। এঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশ বোধহয় এ সময় কাজে লাগতে পারত।

বিনায়ক বর্মা

কোচবিহারের নব নির্বাচিত সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়

ছ’মাসের ব্যবধানে এ কোন ম্যাজিক?

মাথাভাঙা বিধানসভা

	মে ’১৬	নভেম্বর ’১৬
তৃণমূল	৯৬,৩৮৩	১,০২,৯৮২
বিজেপি	৩১,২৫৪	৫৮,১৩০
বাম + কং	৬৪,৪৬৫	১২,৬০৮ + ২,৭০৮

শীতলখুচি বিধানসভা

	মে ’১৬	নভেম্বর ’১৬
তৃণমূল	১,০১,৬৪৭	১,৩০,১১১
বিজেপি	২৭,৩৪৭	৪৮,৫৬৫
বাম + কং	৮৬,১৬৪	৯,১৪০ + ২,৯১০

সিতাই বিধানসভা

	মে ’১৬	নভেম্বর ’১৬
তৃণমূল	১,০৩,৪১০	১,২৯,৩৬৭
বিজেপি	২৭,৮০৯	৫১,৮৭০
বাম + কং	৭৮,১৫৯	৬,৪৩২ + ৮,৫৫০

দিনহাটা বিধানসভা

	মে ’১৬	নভেম্বর ’১৬
তৃণমূল	১,০০,৭৩২	১,২৬,০৫৬
বিজেপি	২৫,৫৯৮	৬২,০৩৬
বাম + কং	৭৮,৯৩৬	১১,৩২৮ + ২,৯৯৯

নাটাবাড়ি বিধানসভা

	মে ’১৬	নভেম্বর ’১৬
তৃণমূল	৯৩,২৫৭	১,২২,৩৪৭
বিজেপি	২১,৫২৪	৪২,১৬৮
বাম + কং	৭৭,১০০	১০,৫২৩ + ৪,৩১৫

কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা

	মে ’১৬	নভেম্বর ’১৬
তৃণমূল	৮২,৮৪৯	৮৩,৩৫১
বিজেপি	১৮,১৭৬	৪৯,৪১৮
বাম + কং	৬৪,৬৫৪	১৪,৪৫৮ + ৩,৮৩০

কোচবিহার উত্তর বিধানসভা

	মে ’১৬	নভেম্বর ’১৬
তৃণমূল	৮৫,৩৩৬	১০,০,১৬০
বিজেপি	৩০,০২৫	৬৮,৯৪৬
বাম + কং	৯৭,৬২৯	২২,৮৪৭ + ৮,১৫৮

চিলাপাতার গভীরে ক্যানোপি রিসর্ট

এক নৈসর্গিক প্রাকৃতিক পরিবেশে জঙ্গল ঘেঁষে ডিমা নদীর তীরে কালচিনি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি গ্রামে ৮০ বিঘা জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে ক্যানোপি ড্রিমজ রিসর্ট। এটি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চিলাপাতা বনক্ষেত্র সংলগ্ন। রিসর্টের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে নদী ও নদীর ওপারেই চিলাপাতার গভীর জঙ্গলের হাতছানি। বিকেলে ও ভোরে ময়ূরের ঝাঁক বা হরিণের পাল আপনাকে স্বাগত জানাবে। সন্ধ্যায় নদীতে জল খেতে আসা বুনোহাতির দলের দেখা মেলে প্রায়ই। রিসর্ট কর্মীরা পটকা ফাটিয়ে হাতির দল তাড়ায়। দু-একবার রিসর্ট চত্বরে বুনোহাতির আগমণের ঘটনা ঘটেছে।

মাদারিহাট থানা থেকে এনএইচ-৩১ ধরে গোরুমারা, হাসিমারা হয়ে ২২ কিলোমিটার, কোচবিহার থেকে সোনাপুর, মথুরা চা-বাগান হয়ে ৩৬ কিলোমিটার, আলিপুরদুয়ার থেকে মথুরা বাগান হয়ে ২৭ কিলোমিটার দূরত্বে এই রিসর্টে। জানা গেল, শাল, সেগুন, মেহগিনি, দারুচিনি, দেবদারুসহ প্রায় সাড়ে চার হাজার গাছগাছালিতে ঘেরা এই রিসর্টে রয়েছে দুটো ‘গাছবাড়ি’, দুই শয্যার। বাচ্চাসহ চারজনও থাকা যায়। রয়েছে দুটো সুউচ্চ ‘টাওয়ারবাড়ি’, তিন শয্যার দুটো ‘তাঁবু’। তিন শয্যার গাছবাড়ির দিনপ্রতি ভাড়া ২,৫০০ টাকা, টাওয়ারবাড়ির দিনপ্রতি ভাড়া ৩,০০০ টাকা, তাঁবুর ভাড়া ২৫০০ টাকা। চিলাপাতায় জঙ্গল সাফারির আয়োজন হয় রিসর্টে বসেই। ভাড়া ১,৮০০ টাকা। সওয়ারি হতে পারবেন ৬ জন। এখান থেকে ঘুরে আসতে

পারেন কোচবিহার রাজবাড়ি, বাণেশ্বর শিব মন্দির, ফুন্টশোলিং, জলদাপাড়া, বক্সা বাঘবন, রসিকবিল। দলবেঁধে ঘুরতে আসা বা মধুচন্দ্রিমাতে আপনাকে স্বাগত জানাবে ক্যানোপি ড্রিমজ রিসর্ট। অতিরিক্ত পাওনা হিসাবে মিলবে রিসর্ট মালিক অভিজিৎ অধিকারী অথবা ম্যানেজার সুভাষ রায়ের আথিতেয়তা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ ঃ ৯৭৭৫৯৭৮৩০২, ৯৭৩৩০৩৪৯৯০।

দিব্যেন্দু ভৌমিক

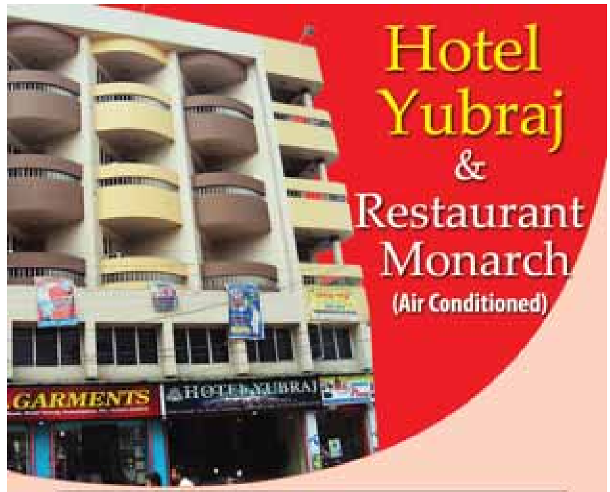

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

WELCOME TO HERITAGE CITY COOCHBEHAR

HOTEL GREEN VIEW

Suit AC, Super Delux, AC, Non AC , Conference Hall

HOTEL Green View

Food & Lodging

Badurbagan Chowpathi, Coochbehar, Contact (03582) 224815/ 229081 (0), 9434756733 (M)

দেবপ্রসাদ রায়

রাজনৈতিক এবং মানবিক সম্পর্কের মিশেলে এই পর্বে একদিকে যেমন সঞ্জয় গান্ধির সঙ্গে প্রথম যৌবনের আন্দোলন, কারাবাসের কথা উচ্চারিত, তেমনই প্রতিফলিত ব্যক্তি-সম্পর্কের মুগ্ধতা। কথায় কথায় উঠে এসেছে অধুনাবিস্মৃত রাম বসাকের প্রসঙ্গ। তাঁর রসবোধ। দিল্লি জীবনের প্রাথমিক পর্বে লেখকের জীবনের ভাঁড়ার দ্রুত ভরে উঠেছিল। উঠোনে একে একে এসে পড়ছিল বর্ণময় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ছায়া। লেখকের অকপট ও সরল বর্ণনার গুণে ধারাবাহিকের আরও একটি স্বাদু পর্ব।

২১

দেরাদুনের ঘটনা আমাকে সঞ্জয়জির ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। কাজেই ২৭ এপ্রিলের পর ১ মে দিল্লি যুব কংগ্রেস যখন সঞ্জয়জির নেতৃত্বে শিবাজি পার্ক থেকে মিছিল করবে ঠিক হল, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এই মিছিলে থাকতেই হবে। কিন্তু মিছিল কনট প্লেস পরিক্রমা করে জনপথে আসবার পরই স্থানীয় দোকানদারদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আজও বুঝে উঠতে পারিনি যে, সেই দিন মারামারিটা কেন শুরু হয়েছিল। শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম, আমাদের ছেলেরা লাঠি দিয়ে দোকানগুলির কাচ ভাঙছে, আর সেই কাচ সুদর্শন চক্রের মতো দোকানিরা মিছিলের দিকে ছুড়ে মারছে। এক ভয়াবহ অবস্থা। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে আগেও পড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল কলকাতায়। কিন্তু কাচের বৃষ্টির মোকাবিলা করবার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। হঠাৎ দেখি, সঞ্জয়জি একজন পুলিশ অফিসারকে জাপটে ধরে তাকে কুস্তির প্যাঁচে রাস্তায় ফেলে তার উপর চেপে বসে আছেন, এবং অন্য সেপাইগুলো সঞ্জয়জির পিঠে সপাসপ লাঠি মারছে অফিসারকে বাঁচাবার জন্য। ভাবছি কতক্ষণে গ্রেপ্তার হব।

বেশি সময় অবশ্য লাগল না। অচিরেই সব্বাইকে পাকড়াও করে পার্লামেন্ট থানায় নিয়ে গেল। সারাদিন বসিয়ে রেখে সব্বাইকে কোর্টে পেশ করা হল রাতে। সঞ্জয়জির জামিন হল, কিন্তু সবার হল না। তিনি বললেন, 'আমি একা জামিন নেব না।'

ফলে সবাই মিলে তিহার জেল। রাত ৩টের সময় জেলে ঢোকানো হল। তিহারের নতুন ব্লক। আমরাই প্রথম বন্দি হিসেবে ওখানে স্থান পেলাম। ব্যারাকের বাইরে দেওয়ালে সদ্য প্লাক বসানো 'ইনাগুরেটেড বাই প্রাইম মিনিস্টার মিঃ চরণ সিং'— জ্বলজ্বল করছে।

এসব দেখে সঞ্জয়জি বললেন, 'ইয়ে ইহাঁ পর নহি রহনা চাহিয়ে।'

বলামাত্র ছেলেরা প্রবল উৎসাহে ওই রাতেই পাথর জোগাড় করে এনে ঠুকে ঠুকে ওই প্লাকটাকে ভাঙল। সঞ্জয়জি শেষে সবাইকে নিজের নিজের বিছানায় যেতে বলে নিজেও একপাশে জায়গা করে নিলেন। যখন কুর্তা খুললেন, দেখলাম পিঠের উপর মনে হচ্ছে কেউ যেন সিঁদুর দিয়ে দাগ টেনে গিয়েছে একের পর এক। আমি বললাম, 'সঞ্জয়জি, এই ঝুঁকি নিলেন কেন? আপনার জীবনের দাম অনেক বেশি।'

'মিঠু, তুমি দিল্লির ছেলেদের চেনো না। আমি না লড়লে ওরা সবাই পালিয়ে যেত।' উনি ব্যাখ্যা দিলেন।

সে যাত্রা তিহারে ছিলাম পাঁচ দিন। উনি রোজই আমায় বলতেন, 'কী করি বলো তো? তোমায় ভাত খাওয়াতে পারছি না। রোজ দু'বেলা রুটি খেতে হচ্ছে।' আমি যত বলি যে, রুটিতে আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, উনি ব্যগ্র হয়ে পড়েন, আমাকে কী করে জেলের ভিতর মাছের ঝোল আর ভাত খাওয়ানো যায়। অনেক সমালোচনার শিকার সঞ্জয় গান্ধিকে হতে হয়েছে। সে অর্থে আমিও ওঁর একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলাম না। কিন্তু জেলের ভিতর ২৯০ জন কয়েদি আমরা— কে কী খাচ্ছি, কার কী অসুবিধা হচ্ছে, জনে জনে রোজ খবর নিয়ে নিজে রাত ৩টে নাগাদ শুতে যেতেন। এই সহমর্মিতা কখনও ভোলবার নয়।

আমার পাশের বেডে একটি অল্পবয়সি ছেলে ছিল। এখন নাম ভুলে গিয়েছি। ও আমায় প্রথম দিনেই বলল, 'দাদা, তুমি নিজে লাইনে দাঁড়িয়ে রুটি এনো না। আমি এনে দেব। আর তোমার থালাও ধুয়ে দেব।' দু'দিন পার হওয়ার পর আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ফ্যামিলির স্টেটাস কী? ও জানাল, ওদের ব্যবসা আছে। যখন জানতে চাইলাম কীসের ব্যবসা, ও জানাল, ব্যবসাটা কলকাতাতেই। কলকাতার রেসের মাঠে তিনটে ঘোড়া দৌড়ায়। আমি ভাবলাম বলি, আজ থেকে তোমার রুটি আমি আনব আর থালাও ধুয়ে দেব!

পাঁচ দিনের মাথায় জেল থেকে বেরনো

হল। শেষ অবধি ভাত আর মাছও জোগাড় হল। বেরবার আগে জেল গেটে বসে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে বার হলাম।

জেলেই জানা গিয়েছিল, সঞ্জয়জি ৭ তারিখ জামশেদপুর যাবেন। ওখানে দাঙ্গা হয়েছে। অনেক মানুষ ঘরছাড়া হয়ে ক্যাম্পে আছে। আমি বললাম, আমিও যাব। সঞ্জয়জি বললেন, '৭ তারিখ ভোরবেলা এয়ারপোর্টে চলে এসো।' আজমিরি গেট থেকে অত সকালে আসতে পারব না। তার চেয়ে বড় কথা, এয়ারপোর্ট পৌঁছাব কী করে? ওই সময় পশ্চিমবাংলার আমাদের সকলের মুশকিল আসান রামদাকে ধরলাম। মানুষটাকে এত স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা যাবে না, তবুও দু'কলম রামদাকে নিয়ে লিখব। উনি বললেন, 'তাহলে আর কী? আমার বাড়িতে রাতে থাকো, সকালে আমি ছেড়ে আসব।' তা-ই হল। হপিং ফ্লাইটে লখনউ, পাটনা হয়ে জামশেদপুর। সারাটা দিন শিবির থেকে শিবিরে। সর্বত্র মানুষ নালিশ জানাচ্ছে, কীভাবে পুলিশের প্রশ্রয়ে সমাজবিরোধীরা মুসলিমদের বাড়িঘর লুঠপাট করে নিয়ে গিয়েছে। উনি সব জায়গাতে একই জবাব দিচ্ছেন, 'আমি প্রতিকার করতে পারব না, তবে দিল্লি ফিরে প্রতিবাদ করার উদ্যোগ নিশ্চয়ই নেব।' পরদিন উনি ফিরে গেলেন দিল্লি, আমি চলে এলাম কলকাতায়। কিন্তু কথা আদায় করে নিয়ে এলাম যে জুন মাসে উনি কলকাতায় আসবেন।

উনি এসেছিলেন কলকাতায় ২২ জুন ১৯৭৯-এ। তবে যুব কংগ্রেসের ডাকে নয়। প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকে। বরকতদা যখন জানতে পারলেন যে আমি সঞ্জয়জিকে কলকাতায় আসতে রাজি করিয়েছি, তখন উনি দেখলেন, একবার যদি যুব কংগ্রেস এই মাইলেজ পায়, তাহলে প্রদেশ কংগ্রেস গুরুত্ব হারাবে। কাজেই কমলনাথজির সাহায্য নিয়ে তারিখটা বদলানো হল। ১৮-র বদলে ২২। আর ব্যানারটা বদলানো হল পিওয়াইসি-র বদলে পিসিসি। কিন্তু সে সময়ে সঞ্জয়জিকে নিয়ে কলকাতার বুকে মিছিল করবার ঝুঁকি নেওয়া কিন্তু ভুল হয়নি। কারণ তাঁর নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দাবিতে 'রাজভবন অভিযান' যথেষ্ট সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

এবার রামদার কথায় আসি। রাম বসাক ছিলেন মূলত ট্রেড ইউনিয়নিস্ট। উনি যাঁর নাম নিতেন বা ওঁর গুরু বলে দাবি করতেন, আমি বা আমাদের প্রজন্ম তাঁর নাম কখনও শোনেনি। মৃণালকান্তি বসু। তবে ছবি দেখিয়েছেন যে, রামদা, মৃণালকান্তিবাবু ও আরও কেউ কেউ চিনের প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অর্থাৎ ওঁরা কখনও চিন ডেলিগেশনে গিয়েছিলেন। তবে রামদার

> সে যাত্রা তিহারে ছিলাম পাঁচ দিন। সঞ্জয়জি রোজই আমায় বলতেন, 'কী করি বলো তো? তোমায় ভাত খাওয়াতে পারছি না। রোজ দু'বেলা রুটি খেতে হচ্ছে।' অনেক সমালোচনার শিকার সঞ্জয় গান্ধিকে হতে হয়েছে। সে অর্থে আমিও ওঁর একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলাম না। কিন্তু জেলের ভিতর ২৯০ জন কয়েদি আমরা— কে কী খাচ্ছি, কার কী অসুবিধা হচ্ছে, জনে জনে রোজ খবর নিয়ে নিজে রাত ৩টে নাগাদ শুতে যেতেন। এই সহমর্মিতা কখনও ভোলবার নয়।

আসল যোগাযোগ ছিল আরএসপি-র নেতৃত্বের সঙ্গে। কোনও সময় নাকি ত্রিদিব চৌধুরীর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবেও কাজ করেছেন। ওঁর চলাফেরা বা মেলামেশা দেখে যেটা বুঝতাম তা হল 'মধ্যস্থতাকারী' হয়ে লোকের কাজ করিয়ে তার পারিশ্রমিক সংগ্রহ করা। প্রসঙ্গত বলি, এটা ডিগনিফায়েড প্রফেশন না হলেও দিল্লিতে এমন এক পেশায় নিযুক্ত বহু মানুষ আছেন এবং যথেষ্ট ভাল জীবনযাপন করেন। সম্প্রতি টাটাদের একজন মহিলা লবিস্ট নীরা রাডিয়াকে নিয়ে যথেষ্ট হইচই হয়েছিল। তিনিও ওই কাজেই যুক্ত ছিলেন।

যা-ই হোক, রামদা ঠিক কী করতেন তা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, আমাদের জন্য কী করেছেন। প্রথম যখন দেখা হল, তখন তিনি প্যাটেলনগরে থাকতেন। তারপর ১২০ নর্থ অ্যাভিনিউতে চলে আসেন। ফ্ল্যাটটা ছিল আরএসপি-র এমপি সনৎ মণ্ডলের নামে। কিন্তু কার্যত হয়ে উঠেছিল রাজ্য কংগ্রেসের দিল্লির ক্যাম্প। কে থাকেনি? সোমেনদা, নুরুলদা, বুলু, আমি, চিনা (নীরেন চ্যাটার্জি), অম্বিকা ব্যানার্জি, শংকর সিং। একবার-দু'বার নয়, বারবার। আর থাকা মানে শুধু থাকা নয়। থাকা-খাওয়া, রাত জেগে তাস খেলা। কোনও কিছুতেই রামদা বা বউদির হাসি ছাড়া কথা ছিল না। পরে নিজে যখন দিল্লিতে ডেরা বেঁধেছি, তখন বুঝেছি, লোককে থাকতে দেওয়া তবু একরকম। কিন্তু এতগুলো পাত পড়ত রোজ একতরফাভাবে। কেউ কখনও ভুলেও বলেনি, রামদা, আজ আমি বাজার করছি। তবু বউদি কখনও বুঝতে দেয়নি, কীভাবে এই দায়িত্ব পালন করে চলছেন। পরে একদিন কথায় কথায় জেনেছিলাম, এমন দিন গিয়েছে, যখন বউদির বালা বন্ধক দিয়ে রামদা বাজার করেছে।

অসম্ভব রসিক লোক ছিলেন রামদা। এবং কাউকেই কিছু বলতে মুখে আটকাত না। তবে অধিকাংশই এত আমিষ যে লেখা যাবে না। তবুও তার ভিতর একটা-দুটো বললে বোঝা যাবে কী ধরনের 'সেন্স অব হিউমার' ছিল ওঁর।

আমাদের কোনও এক নেতাকে তিনি একদিন বলছেন, 'তুই যদি মন্ত্রী হইস, তাহৈলে তর গাড়ির সামনে জাতীয় পতাকা উড়ব না।'

যাকে বলা, তিনি বললেন, 'কেন? তাহলে কী উড়বে?'

'একটা ১০০ টাকার নোট উড়ব পতপত কইরা। কারণ তোর তো খালি মাল কামানো ছাড়া আর কোনও কাজ নাই।' বললেন রামদা।

ভদ্রলোকের শখ ছিল একবার পশ্চিমবাংলা থেকে রাজ্যসভা লড়ার। জেতা-হারা বড় কথা নয়। কিন্তু লড়ছি তো। সুলতান আহমেদ তখন এমএলএ। আটের দশকের শেষ দিক। তখন একজন এমএলএ প্রোপোজ করলেও রাজ্যসভায় মনোনয়ন দাখিল করা যেত। সাত্তারদা ছিলেন সিএলপি লিডার। তিনি এই নাম শুনে সাংবাদিকদের বললেন, 'কে রাম বসাক?' কাগজে ছাপা হল। আমি দেখালাম। রামদা পড়ে বললেন, 'আমারে চিনব ক্যান, আমার ডাইনিং টেবিলটারে চিনব।'

দিল্লিতে কিন্তু দীর্ঘদিন থেকেও বরাবর একরকম উদ্‌বাস্তু হয়েই ছিলেন। প্রয়াত নেতা যতীন চক্রবর্তী ভালবেসে করেয়া হাউজিং-এ একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে দেওয়াতে বাকি জীবনটা কলকাতায় কাটিয়ে গিয়েছেন। আমার প্রতি যেমন প্রগাঢ় স্নেহ ছিল, তেমনি অধিকারও ছিল। সিনেমার টিকিট, রেলের রিজার্ভেশন, প্রয়োজনে রাস্তায় 'পুলিশি সহায়তা'— উনিই ডি পি রায়— এমপি। আমি '৯০-এ রিটায়ার করার পরেও একদিন যখন দেখি রামদা 'ডি পি রায়— এমপি' বলে ফোন করছে, আমি বলেছিলাম, 'এর পর তোমার জেল হবে।'

লোকটা আজ নেই। কিন্তু কোনও অনাত্মীয়ও যে আত্মীয়র চেয়ে বেশি হতে পারে তা রামদার সঙ্গে না দেখা হলে বুঝতে পারতাম না।

(ক্রমশ)

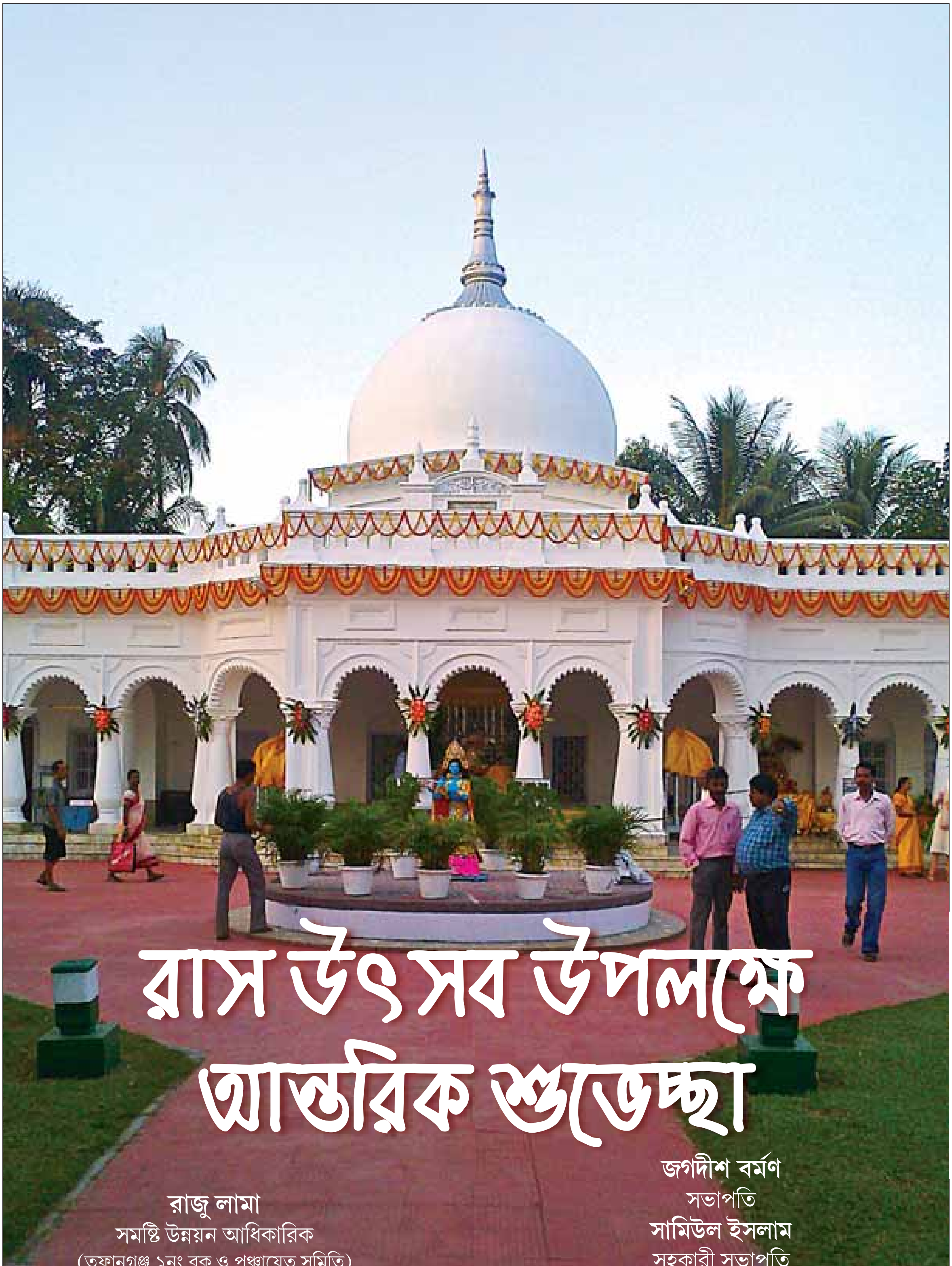
রাস উৎসব উপলক্ষে
আন্তরিক শুভেচ্ছা
জগদীশ বর্মণ
সভাপতি
সামিউল ইসলাম
সহকারী সভাপতি
(তুফানগঞ্জ ১নং ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি)
রাজু লামা
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
(তুফানগঞ্জ ১নং ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি)
তুফানগঞ্জ ১নং ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি, কোচবিহার

এই শীতেই সৃষ্টি হয় দার্জিলিং!

অগ্রহায়ণ মাস ফুরাইতে চলিল। কলকেগ্রাম কলিকা সমিতির আখড়ায় এইমাত্র কলম সিং এক ছিলিম মহাতামাক ভস্মীভূত করিয়া শিবনেত্রে দূরবর্তী বাঁশঝাড়ের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। শীত পড়িয়া গিয়াছে। পাহাড় হইতে ঠান্ডা বাতাস নামিতেছে। স্থানীয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ডুয়ার্সিয়ান বোল্ডার'-এর সম্পাদক বক্সীবাবু কয়েক মাস ব্যবধানে আজ আখড়ায় আসিয়াছেন বলিয়া প্রচুর কথা বলিতেছিলেন। বাকি সবাই মৌন। অকস্মাৎ বক্সীবাবু কহিলেন, 'ভাবছি এবার শীতে টাইগার হিলে সানরাইজ দেখিব।'

বক্সীবাবু প্রবল শীতকাতুরে। লেপ দিয়া ওভারকোট নির্মাণ সম্ভব কি না, সে বিষয়ে শীত আসিলেই অনুসন্ধান শুরু করিয়া দেন। তাই তাঁহার উক্ত বাচনে সকলেই কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হইল। কিন্তু কেহ কিছু বলিবার আগেই কলম সিং বাঁশ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া বক্সীবাবুর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'দার্জিলিঙের টাইগার হিলের কথা বলিতেছেন?'

'আর কোথাও আছে নাকি টাইগার হিল?' বক্সীবাবু একটু অবজ্ঞার সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন। কলম সিং অবশ্য গায়ে না মাখিয়া চাদরখানি টানিয়া লইয়া কহিলেন, 'শীতকালে দার্জিলিঙের কথা শুনিলেই আমার পূর্বপুরুষ ঘনক সিং-এর কাহিনি স্মরণে আসে। একবার পৌষের গোড়ায় হিউয়েন সাং ডুয়ার্সে অসিয়াছিলেন।'

'বলেন কী?' বক্সী একটু ঘাবড়াইলেন, 'ইহা তো কখনও পড়ি নাই।'

'ডুয়ার্সের যথার্থ ইতিহাস রচিত হয় নাই তাই পড়ো নাই। ঘনক সিং-এর অগ্ন্যাধিক্য রোগ ছিল। এই রোগে পরিবেশকে সর্বদা উত্তপ্ত মনে হয়। তাই তিনি উচ্চ পাহাড়ে থাকিতেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার পঞ্চাশ হাত নিচে তাঁহার আশ্রম ছিল। শীতকালে তিনি নিচে নামিয়া যেই স্থানে বাস করিতেন, সেই স্থানেই তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। লাভ হইবার কারণে উক্ত স্থানের নাম হইয়াছিল লাভা।'

সমিতির মিতভাষী সদস্য এবং আন্তর্জাতিক ডুয়ার্স বিশেষজ্ঞ পদব্রজ নন্দী বিচলিত হইয়া বলিলেন, 'লাভ হইতে লাভা? আপনি শিয়োর?'

'ভুটানের রাজা ওঁকে দধি-দুগ্ধ খাইবার জন্য একশত গোরু এবং আশিটি চমরি গাই দিয়াছিলেন। সেগুলি অবশ্য আরও নিচে থাকিত। আমার অনুমান, সেই জায়গাই বর্তমানে গোরুবাথান নামে খ্যাত।' কলম সিং জবাবে কহিলেন।

বক্সী তা-ই শুনিয়া দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'অসম্ভব। আপনার নেশা চড়িয়াছে। প্রমাণ দিতে পারেন?'

'লাভা যাইতে হইলে গোরুবাথান যাইতেই হইবে। ইহাই তো সর্বোচ্চ প্রমাণ।' কলম সিং অবিচলিত কণ্ঠে জানাইলেন। 'পৌষসংক্রান্তির দিন ঘনক সিং তাঁর শিষ্যদের লইয়া গোরুবাথানে চড়ুইভাতি করিতে আসিতেন। তিনি উচ্চমার্গের সহজিয়া সাধক ছিলেন। লুই পাদ, কাহ্ন পাদ প্রমুখ তাঁহার শিষ্য। ঘনক সিং অনেক চর্যাপদ লিখিয়াছিলেন। হর সেইগুলি খুঁজে পায় নাই।'

'হু ইজ হর?' সন্দেহের গলায় জানতে চাইলেন বক্সীবাবু।

'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।' বলিলেন কলম সিং, 'তবে সেসব কথা পরে বলিব। সেইবার চড়ুইভাতিতে আসিয়া ঘনক সিং-এর মাথায় একখানি অপূর্ব চর্যাপদের ভাবনা আসিল। ভুলিয়া যাইবার ভয়ে একটি পাথরের উপর বসিয়া তিনি পদটি হইতে টেক্সট পৃথক করিয়া শিষ্যকে মুখস্থ করাইতেছিলেন, তখন হিউয়েন সাং গোরুর গাড়ি হইতে সেখানে নামিল। জানা গেল যে কামরূপের রাজা তাঁহাকে পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য পাহাড়ে নতুন স্পট খুঁজিতে অনুরোধ করায় তিনি ডুয়ার্স ঘুরিতেছেন। যদি ঘনক সিং-এর সন্ধানে কোনও উপযুক্ত স্থানের সংবাদ

থাকে, তবে তাহা যেন তিনি উল্লেখ করেন।

'ঘনক সিং নেপাল হইতে মেঘালয় অবধি সমস্ত পার্বত্য স্থানের খবর রাখিতেন। তিনি কহিলেন, 'চিন্তা করিয়ো না হিউ! চড়ুইভাতিতে যোগ দিয়া আনন্দ করো। দিনান্তে তোমাকে একটি স্থানে লইয়া যাইব। স্থানটি অতি উত্তম। কিন্তু দক্ষিণ বরাবর একখানি প্রকৃতি নির্মিত প্রাকার থাকায় সৌন্দর্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানটির নাম দার্জিলিং।"

পদব্রজ নন্দী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'দার্জিলিঙের দক্ষিণে প্রাচীর? ইয়ারকি হচ্ছে?'

'যাহা জানো না, তাহা লইয়া কথা বলিয়ো না।' কলম সিং ঈষৎ রুষ্ট স্বরে কহিলেন, 'দার্জিলিঙের দক্ষিণ বরাবর আটষট্টি মিটার উচ্চ একখানি প্রাকার ছিল। উহা আসলে হিমালয়েরই একটি অংশ। উক্ত কারণে দার্জিলিঙে দিনে তিন ঘণ্টার বেশি সূর্যের আলো পড়িত না। হিউয়েন সাং সেই প্রাচীর দেখিয়া বলিলেন, 'স্থানটি অপূর্ব, ইহাতে দ্বিমত নাই। কিন্তু প্রাচীরের ব্যাপারে হুং পিং-এর সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে। তুমি আমার সহিত চিনে চলো। ন্যাওড়া ফরেস্টের মধ্য দিয়া চিনে যাইবার শর্টকাট রাস্তা আছে। আমি ছাড়া কেহ জানে না। এখন যাত্রা করিলে কল্য প্রভাতে বেজিং পৌঁছাইয়া যাইব।'

'চড়ুইভাতিতে স্কোয়াশ আর কপির ঘ্যাঁট দিয়া প্রচুর খিচুড়ি খাইয়াছিলাম। তাই যাত্রায় আপত্তি করিলাম না। হাঁটিলে উদ্‌বৃত্ত তাপ পুড়িয়া যাইবে। সহজিয়া সাধনায় ফিটনেস জরুরি। পরদিন সূর্য উঠিবার কিঞ্চিৎ আগে আমরা বেজিঙে হুং পিং-এর বাড়িতে আসিয়া তাঁহাকে ঘুম থেকে তুলিয়া চা খাইয়া প্রাচীরের সমস্যাটি বুঝাইয়া বলিতে সে দার্জিলিং আসিতে রাজি হইল। আসিবার পর প্রাচীর দেখিয়া সে আমাকে প্রণাম করিয়া চলিল, 'এই শীত চিনের নিরাপত্তার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। চিনের প্রাচীরের কিয়দংশ ভূমিকম্পে ধসিয়া গিয়াছে। মেরামত করিবার মতো প্রস্তর অমিল। এই প্রাচীর ভাঙিয়া সেই প্রস্তররাশি মিলিবে, তাহা মেরামতের পক্ষে যথেষ্ট।'

'আমি ভাবিলাম, ভালই হইল। দার্জিলিং আর চিনের সমস্যা এক প্রাচীরেই মিটিল। হুং পিং কাজও করিল মোক্ষম। দশ দিনের মধ্যে দার্জিলিঙের প্রাচীর লইয়া চলিয়া গেল চিনে। প্রাচীর তুলিয়া দিবার পর দার্জিলিং কেমন হইল তা তোমরা জানো। যাইলেই দেখিতে পাও। কিন্তু শীতের কারণে হুং পিং-এর হিসেবে একটু ভুল হয়। সে সময়ে ডুয়ার্সের চালসা, নাগরাকাটা, হাসিমারা, জয়ন্তি এলাকায় শীতকালে বরফ পড়িত। দার্জিলিঙে বরফ পড়া শুরু হইত দীপাবলির রাত হইতে। মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে সেখানে পাঁচ ফুট পুরু বরফের চাদর। কাজের শেষে হুং পিং বুঝিল, হিসাবের গোলমালে বরফের নিচে সাত ইঞ্চি প্রাচীর থাকিয়া গিয়াছে। তাহা ভাঙা হইল বটে, কিন্তু অত ছোট পাথর চিনের প্রাচীরের কাজে লাগিবে না। তখন ঘনক সিং বলিল যে, পাথরগুলি জ্যামিতিক আকারে সাজাইয়া একখানি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হউক। সেখানে মেলা বসিতে পারিবে। তিনি ক্ষেত্রখানির নাম দিয়াছিলেন মেলাক্ষেত্র।' বলিয়া কলম সিং চুপ করিয়া গেলেন। বাঁশবাগানের দিকে তাকাইয়া একখানি বিড়ি শেষ করিলেন। অপেক্ষা করিতে না পারিয়া বক্সীবাবু ব্যগ্র কণ্ঠে বলিলেন, 'সে ক্ষেত্রে কি মেলা বসেছিল?'

'মেলা হইতেই কি ম্যাল শব্দটা আসে নাই?' বাঁশ হইতে নজর না সরাইয়া বলিলেন কলম সিং, 'আর প্রাচীর সরিল বলিয়াই না টাইগার হিলের ফ্রন্টটা ওপেন হইয়া গেল। অথচ দেখো, দার্জিলিঙের ইতিহাসে ঘনক সিং আর হুং পিং নামে কেহ লিখিল না। ঘনক সিং তখন বাংলার রাজা-গজাদের নিকট দরবার করিয়া বলিল, 'আপনারা শিলালিপিতে চুং পিং-এর নাম কীর্তিত করুন।' কিন্তু উহারা বলিল, 'পুণ্ড্রবর্ধনকেই আমরা বাংলা ভাবি না, দার্জিলিংকে ভাবিব কোন দুঃখে। চাপা নাসিকার মানবদের বাঙালি ভাবিবার নিয়ম নাই।' ইহা জানিয়া চুং পিং অভিশাপ দিয়া ঘনক সিংকে কী বলিয়াছিল জানো?'

সবাই সমস্বরে কহিল, 'কী?'

'তোমরা বঙ্গ প্রদেশের লোকেরা একদিন দার্জিলিং লইয়া মহা ভুগিবে।'

আখড়ায় অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। কলেজপড়ুয়া ছোকরা এক সদস্য এতক্ষণ মুগ্ধ বদনে কলম সিং-এর পূর্বপুরুষের কাহিনি শুনিতেছিল। এইবার সে কহিল, 'কিন্তু হিউয়েন সাং-এর কী হইল?'

'উনি তিনখানি আর্য সত্য দেখিয়াছিলেন। দার্জিলিং হইতে চালসা অবধি ব্যাঘ্রপূর্ণ অরণ্য। শীতকালে ডুয়ার্সের মনোরম আবহাওয়া। তিস্তার রোবলি মৎস্য। উনি অতঃপর ব্যাঘ্র শিকার পর্যটনের কথা ভাবিলেন। ভুটানের রাজার নিকট হইতে ডুয়ার্স আর দার্জিলিং লিজ লইয়া চিন হইতে পর্যটক আনিতে লাগিলেন। তখন আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানরা থাকিত। উহাদের সহিত চিনের সম্পর্ক ভাল থাকায় তাহারাও শিকার-পর্যটনে আসিত। সারারাত ডুয়ার্সের অরণ্যে ব্যাঘ্র শিকার করিয়া ভোরবেলা টাইগার হিলে আসিয়া সবুজ চা খাইতে খাইতে সানরাইজ দেখিত। শিকার করা ব্যাঘ্র লইয়া সূর্যোদয় দর্শনে আসিত বলিয়া উক্ত স্থানকে রেড ইন্ডিয়ানরা বলিত টাইগার কিল। তোমরা অবশ্য হিল বলিয়াই জানো। তবে হিউয়েন সাং পর্যটন ব্যবসা করিয়া যা লাভ করিতেন, তাহা বৌদ্ধধর্মের কাজেই ব্যয় করিতেন। পরে ভূমিকম্পে এভারেস্ট যেবার কাঞ্চনজঙ্ঘার তুলনায় উঁচা হইয়া গেল, সেবার হিউর বানানো রিসর্টগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। গোরুবাথান হইতে চল্লিশ মিনিটে দার্জিলিং যাইবার সুড়ঙ্গপথটিও সেই ভূমিকম্পে হারাইয়া গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যে শীতকালে দার্জিলিঙের কথা উঠিলেই আমি নস্টালজিক হইয়া পড়ি।'

'নস্টালজিক তো ঘনক সিং-এর হওয়ার কথা। আপনি কী করিয়া হচ্ছেন?' বক্সীবাবু প্রশ্ন করিলেন।

কলম সিং হাসিয়া বলিলেন, 'জেনেটিক্স বুঝিলে প্রশ্নটা করিতে না। কিন্তু শীতকালে ডুয়ার্সের পর্যটন কত উচ্চাঙ্গের হইতে পারে, তাহা কিন্তু হিউদা করিয়া দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু উহা আর এখন হইবে না। বাঘগুলি সব ভুটান চলিয়া গিয়েছে। ডুয়ার্সেও আর বরফ পড়ে না। গৌতম একা কী করিবে? তদুপরি চিন আর আমেরিকার সম্পর্ক খারাপ যাইতেছে।'

হাওয়া ক্রমে ঠান্ডা হইতেছিল। সকলেই কমবেশি গুটাইয়া যাইতেছিলেন। সহসা ধূম্রজালে সমিতির ঘর আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বুঝা গেল যে কলম সিং ছিলিমাইতেছেন।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

শীতের ডুয়ার্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বই

সব মানুষই এক অর্থে পাঠক। মোটরগাড়ির চালক যেমন পথে বিভিন্ন সংকেতের পাঠ নেন, তেমনি জ্যোতির্বিদ দূরবীক্ষণে আকাশে নক্ষত্রের মানচিত্র রচনা করেন। জীববিজ্ঞানী বনে পশুপাখির আচরণ অধ্যয়ন করেন। গায়ক তাঁর সামনে রাখা সাংকেতিক স্বরলিপি মিলিয়ে গান করেন। নর্তকী নির্দেশকের তালিম অনুসরণ করে দর্শকদের সামনে আপন অঙ্গকে ছন্দের মতো তুলে ধরেন। তাস খেলোয়াড় আবার খেলতে বসে প্রতিপক্ষের চোখের দিকে তাকিয়ে তার হাতে লুকানো তাসটি কী তা বোঝার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানী তাঁর সামনে বসা রোগীর অন্তরের গভীরে উঁকি দিয়ে চেষ্টা করেন তথ্য সংগ্রহ করতে। এভাবেই জগতে প্রতিনিয়ত সর্বত্র চলছে পাঠ। যে সমাজের লিপি নেই, বই নেই, সেখানেও মানুষ পাঠক।

১৯৮৪ সালে সিরিয়ার তেল বার্ক নামে একটি স্থানে দু'টি মাটির ফলক খুঁজে পাওয়া যায়। পুরাতাত্ত্বিকরা বলেন, আয়তক্ষেত্রাকার ওই ছোট্ট ফলক দুটিই পৃথিবীর প্রথম বইয়ের দু'টি পৃষ্ঠা। ফলক দু'টির গায়ে সাংকেতিক চিহ্ন দেখে বোঝা যায়, সে দু'টি যেন হিসেবের খাতার দু'টি পাতা। তার একটিতে রয়েছে দশটি ছাগলের ইঙ্গিত, অন্যটিতে দশটি ভেড়ার। এই আদি লিপিকৌশল সুমেরিয়ানদের অবদান। প্রাচীন মিশরেও ছিল চিত্রাক্ষর, হায়ারোগ্লিফ। এমন প্রতীক, যা একই সঙ্গে শব্দ, ধ্বনি ও ভাব ধারণে সক্ষম।

> পাঠক বই পড়ে কী পান? এই প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া মুশকিল। আসলে পাঠক তাঁর নিজস্ব চেতনার আলো দিয়ে কোনও লেখা পাঠ করেন। পাঠ করেন লেখককেও। পাঠকের শিক্ষা, শীলন এবং ধী অনুযায়ী সেই পাঠের রকমফের হয়।

লিপির মতোই বিচিত্র বইয়ের পৃথিবী। মেসোপটেমিয়াস যদি মাটির ফলক, মিশরে তবে প্যাপিরাস, নলখাগড়ায় বাখারি দিয়ে তৈরি করা লেখার উপাদান। প্যাপিরাসে লেখা বই 'স্ক্রোল' লাটাইয়ের মতো জড়িয়ে রাখার বই। পার্চমেন্ট বা পশুর চামড়ায় লেখালিখির শুরু খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। তারপর এল বিশ্বজয়ী নতুন এক বিস্ময়, যার নাম কাগজ। ১৯০৭ সালে তুর্কিস্তানের গিরিকন্দরে ব্রিটিশ পুরাতাত্ত্বিক অরেলস্টাইন 'হীরকসূত্র' নামে মুদ্রিত জড়ানো একটি পুঁথি খুঁজে পান। চিনা ভাষায় লেখা সচিত্র এই পুঁথিটিই প্রথম মুদ্রিত বই বলে বন্দিত। এই বই কাঠের ব্লকের সাহায্যে ছাপা হয়েছিল ৮৬৮ সালে। ১৯৭০ সালে কম্পিউটার নিয়ে এল ছাপায় যুগান্তর। নতুন যুগ এল পাঠকের জীবনেও। কেননা কম্পিউটার স্মৃতিধর। সে গ্রন্থভুকও। বোতাম টিপলেই যা প্রয়োজন তা চলে আসে চোখের সামনে। এর পর ট্রেড নেলসন দীক্ষিত করলেন নতুন বিদ্যায়। এল 'হাইপারটেক্সট'।

পাঠক বই পড়ে কী পান? এই প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া মুশকিল। কাফকার বিখ্যাত 'মেটামরফসিস' গল্পটি এক বালিকার কাছে হয়ত নিছক এক হাসির গল্প। অন্য পাঠকের কাছে হয়ত আবার ধর্মতত্ত্ব। ওদিকে ব্রেখট মনে করতেন, সত্যিকারের বলশেভিক সাহিত্যের প্রতিনিধি এই গল্প। মার্কসবাদী সমালোচক লুকোচের মতে, এ গল্প বুর্জোয়া অবক্ষয়ের পরিচিত অবদান। নবোকভ, বর্হেস, আরও কেউ কেউ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন গল্পটি সম্পর্কে। অথচ মজার ব্যাপার হল এটাই যে কারও পাঠের কোনও মিল নেই! আসলে পাঠক তাঁর নিজস্ব চেতনার আলো দিয়ে কোনও লেখা পাঠ করেন। পাঠ করেন লেখককেও। পাঠকের

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬-৮৩৯৮৮
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

শিক্ষা, শীলন এবং ধী অনুযায়ী সেই পাঠের রকমফের হয়।

বিপ্লব হোক কিংবা প্রতিবিপ্লব, বই হল সেই সংগ্রামের এক অমোঘ হাতিয়ার। বাস্তব পরিস্থিতি যদি হয় পুঞ্জীভূত আবর্জনা, তবে তাকে জ্বালিয়ে দেয় বই নামক দেশলাই কাঠি। প্রতিক্রিয়ার জীর্ণ পাতা জ্বলে যায় সে আগুনে। বই তখন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সে বিপ্লব ঘটায়। বই তখন আবাহন করে আনে নতুন শাসক, নতুন সমাজ। সে কারণেই হয়ত নেপোলিয়নের অনুকরণে লেনিন বলেছিলেন, কামান ধ্বংস করেছে ফিউডালিজমকে, কালি ধ্বংস করবে এই পচা সমাজকে। দুই বিপ্লবের মুখে বসে লেখা লেনিনের বিখ্যাত সেই বই দু'টির কথা উল্লেখযোগ্য। একটি, করণীয় কী (হোয়াট ইজ টু বি ডান, ১৯০৪)। অন্যটি, রাষ্ট্র ও বিপ্লব (স্টেট অ্যান্ড রেভলিউশন, ১৯১৭)।

মধ্যরাতের কুমারী শরীর ছিঁড়ে হেমন্তের আকাশ ভেঙে শীত নেমেছে ডুয়ার্সে। এসে গিয়েছে বড়দিন, চড়ুইভাতি আর সার্কাসের দিন। আর কে না জানে, ডুয়ার্সের শীত স্বভাবে-স্বাতন্ত্র্যে একেবারেই ভিন্ন। পুরনো দিনের মতো প্রলম্বিত শীতের সেই হিটলারি দাপট হয়ত এখন আর নেই, তবে এখনও শীতকালের কোনও কোনও দিন ফিনফিনে কুয়াশারা গাঢ় হয়, দখল করে নেয় পথঘাট, হিমাঙ্কের দিকে ধাবিত হয় তাপমান। আমার কাছে শীতের অন্যতম প্রিয় অনুষঙ্গ হল বইমেলা। তার সূচনা অবশ্য ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ বইমেলা। এবার এক-এক করে ডুয়ার্সের জেলাশহরগুলোতে বসবে বইমেলা। বইবিলাসী পাঠক আশ্রয় খুঁজে নেবেন নিজের নিজের প্রিয় বইগুলোর কাছে।

মেলা হল উৎসবের অঙ্গ। মেলা মানুষের মেলবন্ধনের স্থান। খেলামেলা আনন্দই হল মেলার ধর্ম। কোনও ধর্মীয় আচার, কোনও পার্বণ বা উৎসবকে কেন্দ্র করে জমে ওঠে মেলা। মেলার কাজই হল মিলিয়ে দেওয়া। মেলা বহু মানুষকে এক জায়গায় মেলায়। বইমেলাও তা-ই। বই ঘিরে মানুষ মিশে যায় মেলা প্রাঙ্গণে। বই শিক্ষিত মানুষের প্রিয় সঙ্গী। জীবন-জটিলতার হাজার সমস্যা এড়িয়েও মানুষ আজও পড়তে চায়, বইয়ের টান অনুভব করে। সে কারণেই বইমেলার কোনও বিকল্প নেই।

ডুয়ার্সের জেলাগুলোতে বইমেলা শুরু হয়েছিল অন্তরের টান থেকেই। ধীরে ধীরে এভাবেই বইমেলা মিশে গিয়েছে ডুয়ার্সের প্রতিটি মানুষের শোণিতধারার সঙ্গে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত বইমেলা

কে না জানে, ডুয়ার্সের শীত স্বভাবে-স্বাতন্ত্র্যে একেবারেই ভিন্ন। পুরনো দিনের মতো প্রলম্বিত শীতের সেই হিটলারি দাপট হয়ত এখন আর নেই, তবে এখনও শীতকালের কোনও কোনও দিন ফিনফিনে কুয়াশারা গাঢ় হয়, দখল করে নেয় পথঘাট, হিমাঙ্কের দিকে ধাবিত হয় তাপমান। আমার কাছে শীতের অন্যতম প্রিয় অনুষঙ্গ হল বইমেলা।

যেমন ডুয়ার্সে হয়েছে, পাশাপাশি সংগঠক উদ্যোগেও বেশ কিছু বইমেলা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে ডুয়ার্সের আনাচকানাচে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে বইমেলা এক এমন মানসিক শক্তি, যা মনকে যথেচ্ছ চালনের মধ্যে দিয়ে মানসিক উন্নতির দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা ধরে।

তবে একটা কথা অনস্বীকার্য। কলকাতা বইমেলা যাঁরা চাক্ষুষ করেছেন, তাঁরা জানেন যে কী বিপুল বৈভব, কী অনন্ত বিস্তার সেই মেলার। জেলাশহরের বইমেলা সে তুলনায় ক্ষীণতনু, কৃশকায়। পাঠকের মনের খিদে মেটাতে জেলা বইমেলাগুলোর স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হোক, আরও বেশি সংখ্যক প্রকাশক আসুন ডুয়ার্সের জেলা বইমেলাগুলোতে— এটাই আমাদের মতো প্রত্যেকটি বইবিলাসী মানুষের কাম্য।

ছবি: **সায়নি চন্দ**

ঝাঁপি খুলতেই শুধু পিকনিকের স্মৃতি

‘বেশি বেশি করবেন না! তাহলে কিন্তু আমি গাড়ি পালটি খাইয়ে দেব!’

রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে কথাটা বলল আমাদের ট্রাকের ড্রাইভার। আর তাকে ধমকধামক দিতে ট্রাকের পিছনের ডালা থেকে যে উৎসাহীরা লাফিয়ে নেমে গিয়ে কেবিনের দরজার সামনে ভিড় জমিয়েছিল, তাদের সবার চক্ষুস্থির। যা লেভেলের রেলা... দেখেই বোঝা যাচ্ছে ড্রাইভার সাহেব মোটেই ড্রাই নেই!

স্থান— লাটাগুড়ি ফরেস্টের মধ্যে কোথাও একটা।

কাল— রাত সাড়ে আটটা খানেক হবে।

উপলক্ষ— পয়লা জানুয়ারির পিকনিক।

সারাদিনের অসংখ্য কাণ্ডকারখানার শেষে আমরা তখন ঘরে ফেরার পথে। কিন্তু কিছু একটা কারণে গাড়ির গতি বারে বারে মন্থর হয়ে পড়ছে। কখনও কখনও আবার গাড়ি একদম থেমেও পড়ছে। ড্রাইভারের এমন বিদঘুটে মর্জির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, এটা রঙিন জলের জ্বলজ্বলে প্রভাব। সে জলে অবশ্য আমরাও সবাই কমবেশি সিক্ত। বিলিতি বছর শুরুর রীতিনীতিই এমন। কিন্তু তা-ই বলে তিরিশটা প্রাণের সুরক্ষা যার হাতে, সেই ট্রাক ড্রাইভারও? ব্যাটা এরকম হালতে তিরিশ কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে এল, ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে?

অবশ্য দ্রব্যগুণে, তখন ভয় পাওয়ার বদলে, এই সত্য জেনে সবাই দিব্যি দাঁত কেলিয়ে হাসতে লাগলাম। আর পরবর্তীকালে ড্রাইভারের এই ডায়ালগটা প্রাচীন অরণ্যের প্রবাদের মতো অমরত্ব লাভ করল কলেজ ক্যাম্পাসে!

কলেজের ফার্স্ট ইয়ার আর পয়লা জানুয়ারির প্রথম পিকনিক— দুটোকেই বলা যায় অ্যাডাল্ট জীবনে প্রবেশের প্রথম ধাপ। স্বভাবতই সে বছর ওই উত্তাপে জীবন কিছুটা অতিরিক্ত আনন্দেই ঘেরা ছিল। গোঁয়ার ড্রাইভারটার কল্যাণে পিকনিক থেকে ফিরতে রাত দশটা পেরিয়ে গিয়েছিল বটে। কিন্তু তাতে দমবার প্রশ্ন নেই। সেই থেকে নিয়মই হয়ে গেল ইং সাল বদল কালে, চাঁদা তুলে ট্রাক ভাড়া করা। ডিসেম্বর পঁচিশ থেকে জানুয়ারির এক-দু'তারিখের মধ্যে কোনও এক রবিবার তাতে চেপে বেরিয়ে পড়ো! আর মিনিটে মিনিটে বর্ণময় ইতিহাস গড়ো!

ধারালো ঠান্ডা বাতাস আর মগজ জমানো কুয়াশার পিণ্ড ভেদ করে ভোরবেলায় এক ট্রাক উত্তেজনা নিয়ে যাত্রা শুরু। প্রথম রোদের দেখা পেতে পেতে সাধারণত তিস্তা ব্রিজ অবধি অপেক্ষা। কোনও কোনওবার আবার স্পটে পৌঁছে গেলেও— রোদের দেখা নাই রে!

গা গরম করার জন্য সারা রাস্তাই মাইক বাজছে আর চলন্ত ট্রাকে চলছে দুলন্ত নাচ। প্রথম পিকনিকে ‘অ্যানথেম সং’ ছিল ‘তেজাব’ ছবির ‘এক দো তিন’। আর যত দূর মনে পড়ে, শেষবার হাড্ডাহাড্ডি কনটেস্ট চলছিল। ‘ঝুম্মা চুম্মা দে দে’ আর ‘তাম্মা তাম্মা লোগে’র মধ্যে।

একবার তো মনে পড়ে, সারাটা রাস্তাই টিপটিপ বৃষ্টি। খোলা ট্রাকে অল্প একটু ত্রিপলের ছাউনি ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছিল সাবধানি কেউ কেউ। কিন্তু নাচ পার্টির দামাল ছেলের দল কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটা ভণ্ডুল করে দেয়। সাধের ত্রিপল এক ধাক্কায় মাথা থেকে পায়ের নিচে! সেটার চেয়েও

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা

ডুয়ার্স ভূখণ্ডে কাব্যচর্চার বিশাল রূপ বাংলা সাহিত্যজগতে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে 'এখন ডুয়ার্স'-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে 'ডুয়ার্সের হাজার কবিতা' বইটি। শতাধিক কবির সহস্রাধিক কবিতার এই অভূতপূর্ব সংকলনটি প্রকাশের পর অভিভূত হতে শোনা গিয়েছে অনেককেই। গত ২২ শ্রাবণ বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠানটিও ছিল জমজমাট। বাইরে থেকেও কবিতাপ্রেমীরা এসেছিলেন ঔৎসুক্য নিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। বইটির অলংকরণ ও কলেবর প্রশংসিত হয়েছে নানা মহলে। প্রথম থেকেই ঠিক করা হয়েছিল, এই বই প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করবেন কবিরাই। একটি বইয়ের দামে কবিদের দু'টি বই দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু বই প্রকাশের পর তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল, অথচ এখনও অর্ধেকের বেশি সংখ্যক কবি তাঁদের কপি সংগ্রহের ব্যাপারে উদ্যোগ বা উৎসাহ প্রকাশে বিরত। কবিতা পাঠানোর ব্যাপারে যে উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছিল, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বই প্রকাশের পর তা সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যতে এই ধরনের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উৎসাহে ভাটা পড়তে বাধ্য, যা মোটেই কাম্য নয়। কবি-বন্ধুদের তাই অনুরোধ, যাঁরা এখনও নিজেদের কপি সংগ্রহ করেননি, তাঁরা অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। আপনার হাতে বই পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে আমরা রাজি। আমরা চাই ডুয়ার্সের কাব্যচর্চার সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক।

প্রকাশক

জোরদার ভেজা হয়েছিল আরেকবার। এক চা-বাগান দিয়ে যখন ট্রাক পাস করছে, কে জানত সকালে ওই সময় চা গাছের গোড়ায় জল দেবার জন্য জোরালো ওয়াটার জেট চালু থাকে। বিনা নোটিশে আমাদের ট্রাক হঠাৎ সেই জলকামানের লাইন অফ সাইটে ঢুকে পড়ে। উদ্দাম নৃত্যরত জনগণের জন্য সে এক বিরাট আনপ্লেজান্ট সারপ্রাইজ!

যাক গে, গা ভেজানোর কথা অনেক হল। এবার গলা ভেজানোর কথায় আসা যাক।

সে সময়কার বাজেটে গা গরম করার একমাত্র সহায় ভুটানি সুরা। উজ্জ্বল কমলা, সবুজ আর কালো— এই তিনটি রং মনে পড়ে সেই উদ্দীপক তরলের। পিকনিক স্পটের কাছে দিশি বারে প্রথমবার সবুজ রঙেরটা পান করেছিলাম। জীবনেও সেটা প্রথমবার। তাই রংটা চিরকাল মনে থাকবে।

কমলাকে ভোলা যাবে না, কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে সেটা পান করে অবিকল সেই রঙের বমি করতে দেখেছিলাম এক বন্ধুকে। হলিউডের হরর ছবির বাইরে বাস্তব জীবনে এরকম দেখতে পাওয়া সত্যিই দুর্লভ অভিজ্ঞতা। আর যেটার রং কালো, মানে ট্রিপল এক্স ভুটান রাম, সে ছিল আমাদের সর্বকালীন ফেভারিট। নিন্দুকরা বলত, ওই জিনিস নাকি শীতকালে ভুটান আর্মির ঘোড়াদের গা গরম রাখতে খাওয়ানো হয়। তা শুধু ঘোড়া কেন, আমাদের ছোঁড়াদের বেলায়ও একই অর্থে তা যথেষ্ট সুপ্রযুক্ত ছিল। আর শুধু নর্থ বেঙ্গল নয়, আমার ধারণা, নর্থ পোলের শীতকেও বোধহয় ওই জিনিস কাবু করে দেবে।

পান আখ্যানের পর এবার ভোজনের কথায় আসি। রাঁধুনির ভূমিকায় প্রতি পিকনিকে ওয়ান অ্যান্ড অনলি বিন্দাই মঞ্চ আলোকিত করে রাখত। সারা বছর এ সি কলেজের ক্যান্টিনে চপ, চা, ঘুগনির রুটিন তার। আর পিকনিকের দিন মাংস কেনা থেকে রান্নাবান্না— সবটায় একার দাদাগিরি। পানীয়প্রেমীরা ওর উনুন থেকে চার হিসেবে ঝলসানো মাংস চাইলে সে দাবি কখনও নাকচ হত না। কিন্তু বদলে যথেষ্ট কর দিতে হত। জলকর। অর্থাৎ পানীয়র ভাগ। তো, সারাদিনের এই অবিরাম ককটেল শেষে যথেষ্ট টলে যেত বিন্দা। তবে দায়িত্বপূর্ণ লোক তো, তাই সবার খাওয়াদাওয়া খতম হলে তারপর ওর বিখ্যাত বাওয়ালিটা শুরু হত।

শুকনো নদীর বেড-এ, সে এক সশব্দ আর অফুরন্ত হামাগুড়ি পুরাণ। ফলে দিনের শেষে ভাঙা হাটে ওকে ট্রাকে তোলা নিয়ে হত সবচেয়ে বেশি ঝামেলা! একবার তো মনে পড়ে, বেয়াদবি কন্ট্রোল করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে, শেষে রান্নার প্রকাণ্ড কড়াইয়ে বসিয়ে বিন্দাকে ট্রাকস্থ করতে হয়েছিল।

তবে বছর পয়লার পিকনিকটা নিছক বেলেল্লাপনার কালো দাগ কিন্তু নয়। ডুয়ার্সকে পরিপূর্ণ চেনা আর গভীরভাবে ভালবাসার শুরুটা আমাদের সবার ওখান থেকেই। আর ওখান থেকেই অনুভব করা শুরু বন্ধুত্বের অসাধারণ এক অধ্যায়ের। এসবেরই মধ্যে দিয়ে... পেঁয়াজের খোসার মতো এক-একটা আস্তরণ খুলে ফেলি। প্রতি পিকনিকে নিজেকেও যেন আরও বিস্তৃতভাবে জানা সম্পূর্ণ হত...

এর চেয়ে ভালভাবে অ্যাডাল্ট হওয়ার আর কোনও পাঠক্রম হয় নাকি?

সব শেষে আর-একটা ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না।

প্রথম পিকনিকে আমার যাওয়া প্রায় বানচাল হয়ে যেতে বসেছিল, চাঁদার পঁয়ত্রিশ টাকা জোগাড় হচ্ছিল না বলে। পিকনিকের আগের সন্ধ্যায় খুব তোড়জোড় চলছে আমাদের তখনকার আড্ডাস্থল, কদমতলা মোড়ে এবিটিএ বিল্ডিং-এর বারান্দায়। আমি এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে স্রেফ দর্শকের ভূমিকায়। এক সিনিয়র চিত্রশিল্পী দাদা, নীহারদা... হয়ত আমার চুন-মুখ দেখে কিছু বুঝে থাকবে। সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, কী রে, তুই যাবি না শুনছি?

আমতা আমতা আনস্মার্টভাবে, আমার ফুটোকড়ি দশার কথা বলেই ফেললাম। আর তা শুনে নীহারদা আত্মসম্মানরক্ষার্থে প্রস্তুত আমার যাবতীয় আপত্তি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে, নিজের পকেট টু আমার পকেট একটা মানি ট্রান্সফার করে, সমস্যার সমাধান করে দিল।

এর ফল হল দ্বিমুখী। এক তো পিকনিকে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে অ্যাডাল্টহুডে পৌঁছানোর পারফেক্ট ফর্মুলার সন্ধান পাওয়া। আর দ্বিতীয়ত, নীহারদার ওই ঋণ শোধের প্রয়োজনে নিজের ইন্ট্রোভার্ট স্বভাব ভেঙে ফেলে সেই জানুয়ারিতেই প্রথম টিউশনি করা শুরু... সৌজন্যে কলেজ বন্ধু সায়ন দাস। সেই মোড় ঘোরাটা এতটাই ইম্পর্ট্যান্ট আমার কাছে যে, আজ প্রায় পঁচিশ বছর বাদে পয়লা জানুয়ারির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ঋণগুলো শোধ করা জেনুইনলি সাধ্যের বাইরে।

ঋণ, সেই পিকনিকগুলোর... বন্ধুদের নিঃশর্ত সখ্য প্রদানের... এবং নীহারদা বা আরও অনেক অমন সিনিয়রের আমাকে সিরিয়াসলি গুরুত্ব দেবার। বোধ এটুকুই আছে যে এসবের শোধ হয় না। বরং সে বোধকে সঙ্গে নিয়েই প্রতিবার নতুন বছরে পা। ইচ্ছা... আরেকটু ভাল কিছু করার।

অভিজিৎ সরকার

উত্তরঙ্গ তরঙ্গ

৩৬

এক বৎসরাধিককাল অতিবাহিত হয়েছে। কদমতলার পশ্চিমে নিজের বাড়ির উঠোনে বসে হিদারু ফুলের গাছ লাগাবে বলে জমি খুঁড়ছিল। বৈশাখ মাসের আবহাওয়ায় আজ বেশ গরম। সকাল দশটাতেই কড়া রোদ্দুর চারদিকে। ছায়া দেওয়ার মতো গাছগাছালি এখনও বড় হয়ে ওঠেনি। শেষ অঘ্রানে নিজের নতুন বাড়িতে উঠে এসেছে সে। অবশ্য আদি বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ মোটেই কমেনি তার। দিনে একবার না হলেও সপ্তাহে তিন-চার দিন সে বাড়িতে দাদাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা-পরামর্শ করতে যায় হিদারু। দাদারা সবাই যে খুব মিলেমিশে আছে এমন নয়। তবুও কোনও অজ্ঞাত কারণে এখনও এক উঠোনেই বসবাস করছে তারা।

তবে নিজের বাড়িতে হিদারু সুখেই আছে। ছেলেদের পড়ার মতি আছে। এ বাড়িতে বসে সুবিধাই হয়েছে তাদের। হিদারুর ইচ্ছে, যে ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করলে জ্যাকসন মেডিক্যাল ইস্কুলে ভরতি করে দেবে।

কাল বিকেলে শোভার চিঠি এসেছে মাথাভাঙা থেকে। গত শ্রাবণে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি হিদারুর। তবে গগনেন্দ্রর সঙ্গে হয়েছিল। শোভার চিঠির শেষে সে-ও লিখেছে দু'কলম। বিয়েটা বেশ জমিয়ে হয়েছিল ওদের। ইংলিশ ব্যান্ড পার্টি, নবদ্বীপ থেকে আসা হালুইকরের মিঠাই, জেনারেটর ভাড়া করে বিজলির আলো, লেমোনেড... সব মিলিয়ে বেশ হইচই ব্যাপার। শোভার বিয়ের পিঁড়ি ধরেছিল হিদারু। শোভা এখন তাকে 'দাদা' সম্বোধন করে চিঠি লেখে। এই শ্রাবণে সে নাকি বেশ কিছুদিনের জন্য আসছে বাপের বাড়িতে। গগনেন্দ্রও থাকবে তিন-চার দিন। বেশ ঘোরাঘুরি, কথাবার্তা হবে তখন।

খুরপি দিয়ে মাটি আলগা করতে করতে হিদারু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বাড়ির সামনে একটা চমৎকার বাগান করার ইচ্ছে তার। শহরের অনেক বাড়ির সামনেই এখন বাগান আছে। ভারী সুন্দর লাগে দেখতে। সে বাগানে আরও অনেক ফুলের সঙ্গে অবশ্যই থাকবে গ্রান্ডি ফ্লাওয়ার। এই ফুলটা শহরে বেশ জনপ্রিয়। লম্বা গাছে বড় বড় সাদা ফুল ফোটে। এত বড় যে গ্রান্ডি ফ্লাওয়ার বলে সবাই। ভারী সুন্দর তার গন্ধ। সে গাছ অবশ্য লাগানো সবার প্রথমে। উঠোন পেরিয়ে বসার ঘরের বারান্দার লাগোয়া সে গাছ।

গামছা দিয়ে বুক-পিঠ মুখ মুছে হিদারু ছায়ায় বসল। ইদানীং তার মনে এক ধরনের শান্ত ভাব এসেছে। নিজের জীবনকে বুঝতে শিখেছে সে। কংগ্রেস সে করবে, কিন্তু এর পাশাপাশি

‘সে গামছা দিয়ে বুক-পিঠ মুখ মুছে হিদারু ছায়ায় বসল। ইদানীং তার মনে এক ধরনের শান্ত ভাব এসেছে। নিজের জীবনকে বুঝতে শিখেছে সে। কংগ্রেস সে করবে, কিন্তু এর পাশাপাশি নিজের জাতির উন্নতির জন্য কিছু একটা করতে চায় হিদারু। এই জন্য একটা সমিতি তৈরি করার কথাও ভাবছে কিছুদিন ধরে। নাম হবে ‘রাজবংশী জাগরণ সমিতি’।

নিজের জাতির উন্নতির জন্য কিছু একটা করতে চায় হিদারু। এই জন্য একটা সমিতি তৈরি করার কথাও ভাবছে কিছুদিন ধরে। নাম হবে ‘রাজবংশী জাগরণ সমিতি’। পান্ডাপাড়ায় কংগ্রেসে আপিসে একদিন চারুচন্দ্রকে সে কথা বলতে সে খুব উৎসাহ দিয়েছিল। উপেন বর্মনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গেও একদিন আলোচনা সেরে এসেছে হিদারু। তিনি বলেছেন, সমিতি তৈরি করে আগে আলাপ-আলোচনা— এসব করতে। সদস্যদের পড়াশোনারও দরকার। সবচাইতে ভাল হয়, হিদারু যদি কিছু বইপত্র সংগ্রহ করে সমিতির জন্য একটা লাইব্রেরি বানাতে পারে।

ছায়ায় বসে একটু আরাম বোধ করার পর হিদারু মেয়েকে দিয়ে ভিতর থেকে জল আনিয়ে ঢকঢক করে খেল খানিকটা। সামনে কর্মব্যস্ত বড় রাস্তা। বাড়ির পিছন দিকে একটু একটু করে গড়ে উঠছে নতুন একটা পাড়া। বড় রাস্তা থেকে সে পাড়ার গলিটা চলে গিয়েছে হিদারুর বাড়ির পাশ দিয়ে। হিদারু হঠাৎ দেখল যে একটা ঘোড়ার গাড়ি থেকে গোপাল ঘোষ নামছেন। ফেলে আসা একটা বছরে এই লোকটার সঙ্গে হিদারুর সম্পর্ক বেশ গভীর হয়ে উঠেছে। হিদারু মাঝে মাঝেই যায় তাঁর বাড়িতে। গোপাল ঘোষও আসেন কখনও। তবে আজ বেশ কিছুদিন পর আসছেন।

ঘর্মাক্ত গোপাল ঘোষ হাসিমুখে বাইরের বারান্দায় ভেজা পাঞ্জাবিটা শরীর থেকে খুলে মেলে দিলেন। ইতিমধ্যে হিদারুর হাঁকে সাড়া দিয়ে মেয়ে বেরিয়ে এসে বারান্দায় একখানা মাদুর পেতে দিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে জলের ঘটি, বাতাসা আর পান-সুপুরি। গোপাল ঘোষ বাতাসা চিবিয়ে জলটুকু খেয়ে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, ‘আঃ!’ তারপর হিদারুর দিকে তাকিয়ে খুশি খুশি মুখে উচ্চারণ করলেন, ‘এবার সাহেবরা ঠেলায় পড়বে, বুঝলি?’

দেশ জুড়ে পুনরায় জেগে ওঠা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ শহরে আবার আছড়ে পড়েছে। গোপাল ঘোষ সে কথাই বলতে চাইলেন।

‘তুই আবার পুলিশের নজরে পড়িস না।’ তিনি উপদেশের সুরে বলতে লাগলেন। ‘মিছিল-মিটিং-এ বেশি যাওয়ার দরকার নেই। গগনের চিঠি পেলি?’

‘কাল বিকেলের ডাকে পেয়েছি।’

‘আমিও পেয়েছি কাল। লিখেছে, এখানে ক’দিন থাকতে আসবে। উপেনের খোঁজ করবে আবার। আমি সকালেই জবাব লিখে ডাকে দিয়েছি। বলেছি, উপেনের খোঁজ নিয়ে আর চেষ্টাচরিত্র করতে হবে না। সে দেশের খাতায় নাম লিখিয়েছি। তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। তোমরা বরং মন দিয়ে সংসারধর্ম পালন করো। কপালে যদি থাকে তো সে ছেলেকে পাওয়া যাবে। আর খোঁজখবরের দরকার নেই।’

গোপাল ঘোষ কথাগুলো বলে চুপ করলেন। শোভার বিয়েতে শেষ পর্যন্ত উপেন আসবে— এটা তারা সবাই ভেবেছিল। কিন্তু বিয়ের দিনকয়েক আগে আলিপুরদুয়ার থেকে উপেনের চিঠি নিয়ে মঘা দেওয়ানের লোক এসেছিল খুদিদার বাড়িতে। মঘা দেওয়ান কথা রেখেছিলেন। উপেনকে তিনি শোভা আর গগনেন্দ্রর বিয়ের সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিলেন লোক মারফত। খবর পেয়ে উপেন চিঠি দিয়েছিল একটা। বোন শোভা আর বন্ধু গগনেন্দ্রকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ এবং ভালবাসা জানিয়েছিল চিঠিতে। আর লিখেছিল যে, তাঁকে যেন খোঁজার চেষ্টা না করা হয়। হিদারুও পড়েছিল সে চিঠি। কিন্তু গগনেন্দ্র মনে করে যে উপেনকে সে খুঁজে পাবেই।

‘সে দিন কী কাজ করার কথা বলছিলি?’ প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইলেন গোপাল ঘোষ। হিদারু গামছাটা কোমরে পেঁচিয়ে গোপাল ঘোষের সামনে বসল। কিছুদিন ধরে তার মনে হচ্ছে, কোনও একটা কাজ পেলে মন্দ হয় না। ফসলের দাম খুবই কম যাচ্ছে। নগদ টাকা হাতে বিশেষ থাকে না। এই অবস্থায় ছোটখাটো একটা চাকরি পেলে হিদারুর সুবিধাই হয়।

‘চাইলে একটা চাকরি তোকে জোগাড় করে দেওয়াই যায়।’ বললেন গোপাল ঘোষ। ‘তবে বেতন খুব সামান্যই হবে। চা-বাগানে যেতে চাইলে অবশ্যি বেতন খারাপ পাবি না। ব্যবসা করবি?’

হিদারু দ্বিধায় পড়ে যায়। ব্যবসা তাদের পরিবারের কেউ কখনও করেনি। সে একটু ইতস্তত করে বলে, ‘ব্যবসায় তো টাকাপয়সা লাগবে দাদা?’

‘কাঠের ব্যবসায় লেগে পড় না!’ গোপাল ঘোষ উৎসাহিত হয়ে বলেন, ‘টাকাপয়সা লাগবে না। আলিপুরদুয়ার থেকে কাঠ আনবি। পরিশ্রম হবে, তবে কামাই খারাপ হবে না বুঝলি?’

‘কাঠ আমি চিনিই না।’ হিদারু হাসল। ‘তবে আপনি থাকলে আলাদা কথা।’

‘আমার ম্যানেজার হবি? ইংরেজি তো জানিস খানিকটা। আমার একটা ম্যানেজার দরকার। ভাবছি এইবার পুরোপুরি পলিটিক্সে নেমে পড়ব। তুই ম্যানেজার থাকলে নিশ্চিন্ত। মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেব তোকে।’

‘আপনি সত্যিই পলিটিক্স করবেন দাদা?’

গোপাল ঘোষ প্রশ্নটা শুনে কোনও জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ গ্রান্ডি ফ্লাওয়ারের চারাটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। একসময় হিদারু শুনল তিনি আপন মনেই জবাব দিচ্ছেন। টাকাপয়সা, বিষয়সম্পত্তির খুব একটা অভাব নেই তাঁর। কিন্তু নিঃসন্তান তিনি। কে ভোগ করবে এইসব? পলিটিক্স করে কিছু খরচা করলে দেশের কাজে লাগবে। তারপর শেষ জীবনে সব কিছু গান্ধিজির নামে লিখে দিয়ে তিনি চলে যাবেন কাশী। যদি উপেনের সঙ্গে কোনও দিন দেখা হয়, তবে তাঁকে দিয়ে দেবেন বেশ কিছু টাকা। শহরে একটা স্কুলও তৈরি করার ইচ্ছে হয় তাঁর।

‘ব্যবসা-ট্যবসা তো অনেক করলাম রে হিদারু!’ আপন মনেই বলে যান তিনি। ‘চা-বাগানের শেয়ারও কম কিনে রাখিনি। হাতিও আছে একটা। ভাবছি সব বিলিয়ে দেব। লোকে আমাকে মনে রাখবে না তাহলে?’

গোপাল ঘোষ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হিদারুর দিকে। হিদারু মাথা নিচু করল। উভয়ের নীরবতায় কেটে গেল কিছুক্ষণ সময়। বড় রাস্তা থেকে ভেসে আসা মানুষের কোলাহল, গোরুর ডাক, কাকের ডাক প্রকট হয়ে উঠতে থাকল হিদারুর কানে। কয়েকটা শালিক এসে নামল উঠোনে। পাশের গলি দিয়ে প্যাঁক প্যাঁক শব্দ তুলে একটা হাঁস দৌড়াতে লাগল তাঁর ছানাদের নিয়ে। দূরে গাছপালার ফাঁকে শব্দ তুলে একটা মালগাড়ি ঝিকঝিক করে এগিয়ে যেতে লাগল স্টেশনের দিকে।

‘চল। আমি জমি খুঁজে বার করে স্কুল বানিয়ে ফেলি। সেখানে তোর একটা চাকরি হয়ে যাবে।’

নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন গোপাল ঘোষ। হিদারু দেখল তাঁর দুই চোখ চকচক করছে উৎসাহে। *(ক্রমশ)*

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

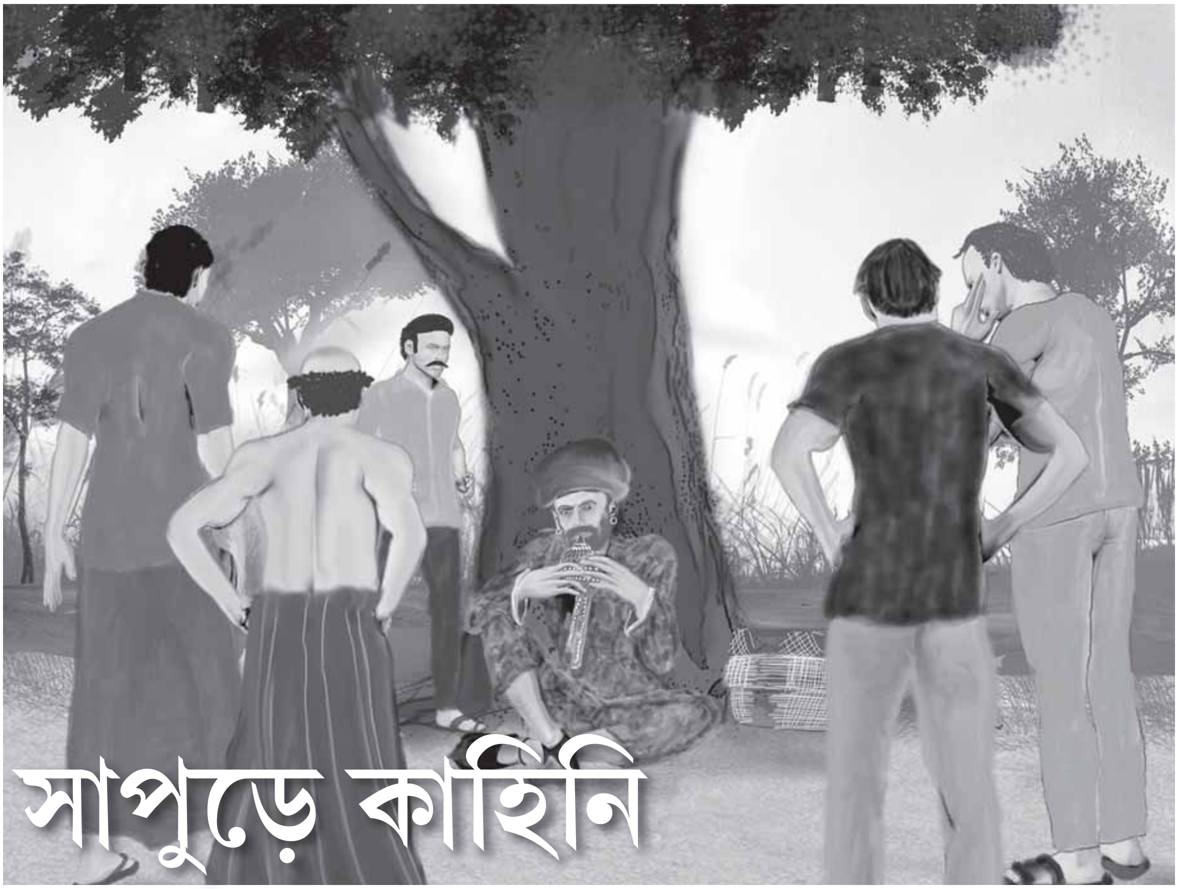

সাপুড়ে কাহিনি

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স

সাগরিকা রায়

স্টেশন কাছে। বিকেল হলে মাঝেমধ্যে সেদিকটাতে ঘুরতে যেতে বেশ ভাল লাগে নিখিল মাস্টারের। মনে হয় যেন বহু দূরে চলে এসেছেন। দু'-চারটে রেল কোয়ার্টার প্রাণহীনভাবে দাঁড়িয়ে কিছু আদিবাসী ছেলেকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। দিনশেষে রাখালি করে ঘরে ফিরছে। রাস্তার ধারে বনকাঁঠাল পেকে হলুদ হয়ে আছে। স্টেশনের পিছনের বন থেকে ঘরে ফেরা পাখিদের কাকলি শোনা যায়। নিঝুম হয়ে আসছে চারধার। কোথা থেকে সন্ধ্যামালতী ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। ওই একটা খেঁকশিয়াল কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

এই স্টেশনেই আলাপ হল রিকশাওয়ালা লছমনের সঙ্গে। গম্ভীর স্বভাবের লোক লছমন। ছট পরবের সময় মাস্টারমশাইকে ঠেকুয়া খাইয়েছিল। কথাবার্তা বলার সময় বোঝা যায়নি লছমনের রহস্যময়তা। সে দিন একটা কাণ্ড হল। এক সাপুড়ে এসেছিল চামুর্চি থেকে। সঙ্গে গোটাকয়েক ঝাঁপি। অজগর, বোড়ো, গোখরো, করাইত সাপ ভরতি ঝাঁপি। বিবাদটা বাধল কী নিয়ে কে জানে! একটা সময় দেখা গেল, সাপুড়ে আর লছমন হাতাহাতি করার অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে। লোকজন গিয়ে ধরে-বেঁধে তাদের দ্বন্দ্ব মেটাল। বোঝা গেল, সাপুড়ে কোনওভাবে লছমনকে অপমান করছে। লছমন স্বভাবগতভাবে গম্ভীর প্রকৃতির। রাগ চেপে রাখাটা তার স্বভাব কি না তা তখন বোঝা যায়নি। বোঝা গেল দিন পাঁচেক পরে। সে দিনও সাপুড়ে এসেছে টিশনে। সঙ্গে সাপের ঝাঁপি। গুছিয়ে বসেছে সে অশ্বত্থ গাছের তলায়। পেটমোটা, নানা রঙের কড়ি বসানো বাঁশি বাজাতে শুরুও করেছে সে। অদ্ভুত সুরে বাঁশি বেজে উঠেছে। বাঁশির শব্দে ভিড় জমতে শুরু করেছে। একজন-দু'জন করে উৎসাহী দর্শকরা সাপের ঝাঁপি দেখছে। সাপুড়ের হলুদ রঙের বিশাল ঝোলা একপাশে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। তার জোব্বায় হরেক রং। মাথায় বিশাল পাগড়ি। সরু সরু তীক্ষ্ণ চোখে কাজল। কানে মাকড়ি। সে যতটা দ্রষ্টব্য, তার বাঁশি ততটাই আকৃষ্ট করল সবাইকে। বাঁশির শরীর জুড়ে কড়ি, চুমকি, পুঁতি। এই সাপুড়েরা রাজস্থানের বাসিন্দা। এদের কালবেলিয়া বলা হয়। নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে খেলা দেখাতে দেখাতে ডুয়ার্সে পৌঁছে গিয়েছে। রথ দেখা আর কলা বেচার অবস্থা আর কী! ডুয়ার্সে সাপ পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে খেলা দেখানোর ব্যাপারটাও...। সাপুড়ে তো খেলা দেখানোর আগে বাঁশিতে সুর তুলে ভিড় টানছিল। যখন দেখা গেল যে যথেষ্ট ভিড় হয়েছে, তখন সে বাঁশি থামাল। বাঁশিটা মুখ থেকে বার করে রাখবে, কিন্তু এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। কিছুতেই বাঁশিটা মুখ থেকে বার হচ্ছে না। বরং উলটো কাণ্ড ঘটল। বাঁশি ক্রমশ মুখের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে! পেটমোটা জায়গাটা আস্তে আস্তে মুখের ভিতরে যাচ্ছে। অথচ তখনও বাঁশিটা কড়ি, চুমকি-টুমকিসুদ্ধ ঠেলে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে মুখের ভিতরে। ভিড়ের মধ্যে ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল। সাপুড়ে বুঝি মারাই গেল।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 15,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

লছমন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। এই অবস্থায় সে সামান্য নড়েনি। মিচকি মিচকি হেসে যাচ্ছে। সাপুড়ে তখন শুয়ে পড়েছে মাটিতে। ভয়ানক ছটফট করে যাচ্ছে। তখন এগিয়ে গেল লছমন। কী আশ্চর্য! সাপুড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে লছমনকে দেখল। মাত্র পাঁচ দিন আগেই লছমনের সঙ্গে তার একটা বাদানুবাদ হয়েছিল। কী বুঝল সাপুড়ে, কে জানে! হাত দুটো জোর করে ক্ষমা চাইল। তার দু'চোখের আকুতিতে নরম হল লছমন। কী মন্ত্র পড়ল কে জানে? হাত নেড়ে নেড়ে সাপুড়ের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে কী সব আওড়াতে লাগল। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বাঁশিটা। সম্পূর্ণ বাঁশটা বেরিয়ে এলে সাপুড়ে 'বাপ' শব্দ করে সটান শুয়ে পড়ল। লছমন অবজ্ঞাভরে পিছু ফিরল। সওয়ারির খোঁজে ফের গিয়ে দাঁড়াল টিশনের ধারে।

নিখিল মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করেছিলেন লছমনকে, কী ব্যাপার লছমন? তুমি দেখছি মন্ত্রতন্ত্র জানো! লছমন লজ্জিতভাবে মাথা নাড়ে— ও কুছ নহি সাব। ওসব কুছ নহি।

কুছ তো থা! কিন্তু যদি না বলতে চায়, তাহলে কী করে আর জানা যাবে? তবে নিখিল মাস্টারমশাইয়ের ডুয়ার্সের জীবনযাত্রায় অভিজ্ঞতা আরও বাড়ল। এই ঘটনার পরে লছমন চলে গেল দেশে। দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে ছেলে ভোলাকে পাঠিয়ে দিল। ভোলা তখন বেশ ছোট। গলায় দড়ির সঙ্গে ঝুড়ি ঝুলিয়ে বাদাম বেচত বাস স্ট্যান্ডে। কোথাও গোলমাল হলে ছুটে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াত চেঁচাতে চেঁচাত, কা হৈ ল বা? এ ভাই, কা হৈ ল বা?

সেই সাপুড়ের সঙ্গে আর দেখা হল না নিখিল মাস্টারের। সে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। চলে গিয়েছিল ডুয়ার্স ছেড়ে। কিন্তু বহুদিন পরে তাকে দেখা গিয়েছিল গয়েরকাটার হাটে। দেখেছিল এতোয়া লাকড়া। বড্ড বুড়ো হয়ে গিয়েছিল সাপুড়ে। ছোট ছোট সাপের বাচ্চা বিক্রি করছিল সে। খবরটা শুনে চনমনে করে উঠেছিল তিনাই। সাপের বাচ্চা পোষার অভিজ্ঞতাটাই নেই তার। টিয়ে, ময়না, খরগোশ, হাঁস-মুরগি, কুকুর... সবই পুষেছে সে। কিন্তু সাপের বাচ্চা!

শখ হতে পারে। শখপূরণের জন্য সময় লাগে। গয়েরকাটার হাটে একবার আদা খুব সস্তা যাচ্ছিল। সেই আদা কেনার ছুতোয় গয়েরকাটায় গিয়ে হাজির হল তিনাই। ফিরল যখন, সঙ্গে আদার পুঁটুলি ছাড়াও একটা ঠোঙা রয়েছে।

—ওটা কী রে? বাড়িতে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল।

—সরে যাও, সরে যাও।

কৌতূহলী পরিজনরা উঁকি দেয়, ঝুঁকি দেয়। অবশেষে একটা মাটির হাঁড়ির ভিতরে ঠোঙার পদার্থটাকে ঠেলে দিল তিনাই। মাগো! সাপ যে!

—হ্যাঁ, সাপের বাচ্চা! খুব সস্তা। মাত্র এগারো টাকা! অজগরের বাচ্চা। বিজয়ীর হাসি হাসে তিনাই। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা তিনাইয়ের মায়ের মাথায় বুদ্ধির বাল্‌ব জ্বলে উঠেছে ততক্ষণে। কাটিহার থেকে সদ্য আসা সাপের ওঝা মতি ওঝাকে খবর দিয়ে আসা হল। পরদিন বেলা দশটা নাগাদ মতি এল। তেল-জলে সাপটে রাখা চুল, শুকনো চেহারা, মুখ ভরতি পান, নীল চেক কাটা লুঙ্গি, মোজাহীন ভারী জুতো পরে এসে দাঁড়াল বাড়ির উঠোনে— কোনখানটিতে আছে মাগো সাপ?

—ওই যে। আঙুল তুলে হাঁড়ি দেখাল তিনাইয়ের মা। উঠোনের এক কোণে মাটির হাঁড়ি। সেদিকে তাকিয়ে পা টিপে টিপে এগল মতি ওঝা। একবার হাত বাড়ায়, তো ফের হাত সরিয়ে নেয়। এমন চলল বার দশেক। তিনাইয়ের মা খুব বিরক্ত— তুমি সত্যি ওঝা তো? ভয় পাচ্ছ কেন?

ঠিকরে উঠল মতি ওঝা— মতি ওঝা মিত্যে কতা বলে না।

—তাহলে?

প্রশ্নটা সবার মনেই উঁকি দিয়েছিল। এতগুলো সন্দিহান চোখের সামনে অপেক্ষা করার সাহস পেল না মতি ওঝা। যা হয় হোক, ভাব করে ঝটকা মেরে হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দিতেই তিড়িং করে বেরিয়ে এল সাপ। তখন তো সবাই প্রাণ বাঁচাতে 'পাইলে আয় রে পাইলে আয়!' বলে ছুটে গিয়ে বারান্দায় উঠে পড়ল। সাপটা মুহূর্তে ঢুকে পড়ল ইটের পাঁজার মধ্যে। বেশ এক হুল্লোড় হল। কেবল মতি ওঝা ইটের পাঁজার কাছে হামাগুড়ি দিয়ে বসে রইল— সাপ বার হলেই খপ!

সে বাপকে আর ধরা যায়নি। মতি ওঝা হাত-পা নেড়ে সবাইকে বোঝাল যে ওই সাপ কাউকে কাটবে না। তবে যদি দেখা যায় যে সাপটা বেরিয়েছে, তাহলে ধানখেতের ধারে মতি ওঝার অস্থায়ী বাসস্থানে গিয়ে খবর দিলে সে চলে আসবে।

সারাদিন দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটল। কে জানে সাপ গিয়ে কোথায় ঢুকেছে! এর পর বহু বছর কেটে গিয়েছে। বাড়ির এদিক-ওদিকে গর্ত দেখলেই বাচ্চারা 'সাপের গর্ত!' বলে চেঁচাত।

তবে সত্যি, সাপটা গেল কোথায়? ইটের পাঁজা সরে যাওয়ার পরে তাকে দেখাও যায়নি। পিছনের কাঁচা নর্দমা দিয়ে চলে গিয়েছিল কি? যেখানেই যাক, কাউকেই সে কামড়ায়নি। একবার অন্তত মতি ওঝা 'মিত্যে কতা' বলেনি!

অঙ্কন: **দেবরাজ কর**

অরণ্য মিত্র

৬১

দাসবাবু এসেছেন ডুয়ার্স-আসাম সীমান্তের কাছাকাছি বারোবিশায়। পল অধিকারীর অনেকটা কাছাকাছি যাওয়া যাবে এই যাত্রায়। অন্য দিকে, দিল্লি হাই গ্রুপের হয়ে ডুয়ার্স সামলাতে আসা এবং দাসবাবুর স্থলাভিষিক্ত রঞ্জিত চেরাপুঞ্জিতে গোপন তথ্য জানার জন্য নেমেছেন গুয়াহাটি। সেখানে তিনি কাকে দেখলেন অপ্রত্যাশিতভাবে? এর মধ্যে মনামি, সুষমা এবং মুনমুনকে নিয়ে কাউকে ফাঁদে ফেলার পরিকল্পনা আঁটছেন সুরেশ কুমার। দুই যুযুধান কালো গোষ্ঠীর সংঘর্ষের পটভূমি তৈরি হচ্ছে ক্রমশ ডুয়ার্সের সবুজ পরিবেশে।

বুদ্ধ ব্যানার্জিকে জলপাইগুড়িতে নামিয়ে দেওয়ার পর তিনি কোথায় গেলেন, সেটা দাসবাবু এখনও জানেন না। কথা ছিল, তিনি পরে যোগাযোগ করবেন। দিন চারেক অপেক্ষায় থাকার পর দাসবাবু বুঝতে পারলেন যে বুদ্ধ ব্যানার্জি ডুয়ার্সে নেই। পল অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগের যে রাস্তাটা বেরিয়েছে, সেটা কাজে লাগাতে হলে তাঁকে আসাম সীমান্তে যেতে হবে। ডুয়ার্সের পূর্ব সীমান্ত সংকোশ নদীর পাড়ে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে। নদী পেরলেই আসাম। দাসবাবুকে যেতে হবে বারোবিশায়। জায়গাটা ছোট শহরের মতো খানিকটা। চার লেনের রাস্তা হয়ে যাওয়ার কারণে দিন দিন এই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে নানা কারণে। পল অধিকারীর লোক আসবে নদীর ওপারে আসামের শিমুলতাপু থেকে।

ফলে সকাল সকাল তিনি এনবিএসটিসি-র বাসে উঠে পড়েছিলেন। বারোবিশায় ঢোকার মুখে চৌপথির মোড়ে তাঁকে জোড়াই যাওয়ার বাসটা নামিয়ে দিল সাড়ে এগারোটা নাগাদ। তাঁদের কাজকর্মের নিরিখে বারোবিশা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। তাই এখানে দাসবাবুর কিছু পোক্ত লোকজন আছে। তিনি বাস থেকে নেমে পুব মুখে সামান্য হেঁটে বাজারের মধ্যে ঢুকলেন। দোকানপাট সবই খোলা, তবে ব্যস্ততা এখন স্বাভাবিক কারণেই কম। এদিক-ওদিক হাঁটাহাঁটি করার পর সবজি বাজারের নির্দিষ্ট দোকানটা নজরে এল তাঁর। মাঝবয়সি বিক্রেতা তাঁর দিকে পিছন ফিরে কিছু একটা খুঁজছিল। দাসবাবু একটু গলাখাঁকারি দিতেই ঘাড় ঘোরাল সে।

'এইখানেই তো ছিল। লাল টুবি।' দাসবাবুকে বলল সে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দাসবাবুর কাছাকাছি এসে চাপা স্বরে বলল, 'সামনের দিকে দেখেন। ওই লটারির দোকানটার কাছে।'

দাসবাবু এগিয়ে গেলেন। লটারির দোকান ঘিরে তিন-চারজন দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একটা অল্পবয়সি ছেলের মাথায় লাল ক্যাপ। তিনি ওদের বেশ কাছাকাছি এসে পকেট থেকে মোবাইল বার করে কানে লাগিয়ে সামান্য জোরে বললেন, 'হ্যালো। কেয়া আস-পাস দাস হ্যায়?'

লাল টুপি তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকাল দাসবাবুর দিকে। তারপর তাঁর পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করল। কিছুটা হাঁটার পর সে গতি বাড়িয়ে দাসবাবুকে টপকে সামনে হাঁটতে শুরু করল। এটা আসলে পথনির্দেশ। বাজারের মধ্যে দিয়ে তাকে অনুসরণ করে দাসবাবু উঠে এলেন কুমারগ্রাম রোডে। লাল টুপি একটা টোটোকে দাঁড় করিয়েছে। দাসবাবু তাতে উঠে পড়লেন। লাল টুপি তাঁর পাশে বসে চালককে কোনও একটা জায়গার কথা বলতে সে চলতে শুরু করে দিল কুমারগ্রাম রোড ধরে উত্তর দিকে।

কিছুক্ষণ পর দাসবাবু আলতো স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কদ্দূর জায়গাটা?'

'চ্যাংমারি সার। টোটোটা আমাদেরই।'

ডুয়ার্স দাসবাবু হাতের তালুর মতোই চেনেন। তিনি অনুমান করলেন যে চ্যাংমারি নামক জায়গাটায় রায়ডাক নদীর কোল ঘেঁষে যে লোকালয় গড়ে উঠেছে, সেখানেই কোথাও মিটিং-এর জায়গা ঠিক করা হয়েছে। তাহলে কি পল অধিকারী কাছাকাছি কোথাও আছে? ভুটান সীমানা বরাবর কোথায় কী আছে তা জানার ব্যাপারে পল অধিকারীকে বিশেষজ্ঞ বললে কমই বলা হয়। হতে পারে সে হয়ত এখন আছে কুমারগ্রামে। জায়গাটা ওই চ্যাংমারি থেকে তো দূরে নয়। কুমারগ্রাম চা-বাগান টপকে উত্তরে ভুটান সীমানা। তার আগে গভীর অরণ্য ভেদ করে নেমে আসা আধ ডজন নদী ভাগ হয়ে মিশে গিয়েছে কুমারগ্রামের পূর্ব-পশ্চিম সীমায় বয়ে যাওয়া সংকোশ আর রায়ডাক নদীর ধারায়।

দাসবাবু সোজা হয়ে বসলেন। টোটো তরতর করে ছুটছে। প্রায় আধ ঘণ্টা দৌড়ানোর পর রাস্তার একটা বাঁকের সামনে দাঁড়াতেই দাসবাবু বুঝলেন তাঁর অনুমান সত্যি। পাশই রায়ডাকের চর। দূরে জলের রেখা। অন্য দিকে গাছপালায় ঢাকা লোকালয়।

'আসেন সার। সামনেই বাড়ি।'

লাল টুপি নেমে পড়ল। কাঁচা গলিপথ দিয়ে মিনিট দুয়েক তাকে অনুসরণ করে দাসবাবু একটা উঠোনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। উঠোন পেরিয়ে ছোট একটা পাকা বাড়ি। লাল টুপি তাঁকে সেই বাড়ির বাইরের ঘরে বসিয়ে দিল। ঘরে আসবাব বলতে প্লাস্টিকের দুটো চেয়ার আর একখানা তক্তপোশ। লাল টুপি তাঁকে বসিয়ে বেরিয়ে যেতেই একজন শীর্ণ চেহারার ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলেন। দাসবাবু অনুমান করলেন যে ইনিই বাড়ির মালিক।

'সুপুরি এনেছেন?'

শীর্ণ ব্যক্তির প্রশ্নে দাসবাবু পকেট থেকে একটা গোটা সুপুরি বার করে এগিয়ে দিলেন। ব্যক্তিটি একটি আতশকাচ বার করেছেন ফতুয়ার পকেট থেকে। সেটা দিয়ে সুপুরিটা পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসলেন। সাদা চোখে না দেখা গেলেও সুপুরির গায়ে একটা চিহ্ন খোদাই করে দেওয়া আছে।

'আপনার জন্য লোক শিমুলতাপু থেকে এসে অপেক্ষা করছে।' শীর্ণ ব্যক্তিটি তক্তপোশে বাবু হয়ে বসে বললেন। ঘরে একটি সাতাশ-আটাশ বছরের ছেলে এসে ঢুকল। দাসবাবুর পাশের চেয়ারে বসল সে।

'আপনি পল অধিকারীকে মিট করতে চাইছেন?' ছেলেটি শান্ত গলায় বলল, 'সে কিন্তু একটা দলের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে।'

'কত?' নিরুত্তাপ স্বরে জানতে চাইলেন দাসবাবু।

'ফিফটি।'

'আমি ওয়ান ক্রোড় অফার রাখছি।'

'ক্যাশ চাই। একশো টাকার নোটে। আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। সেখান থেকে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি।'

'ডান।'

'আপনাদের ডিমান্ডটা কী?'

'যারা পঞ্চাশ লাখ দিয়েছে, তারাই সম্ভবত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ওরা ডার্ক ক্যালকাটা নামের একটা অর্গানাইজেশনের লোক। নতুন অর্গানাইজেশন। ডুয়ার্সে এদের রুট উপড়ে দিতে হবে। চিন থেকে স্যাটেলাইট ফোনগুলো পাওয়ার পর অন্তত তিনটে সেট আমাদের দেবেন। উইথ ফিউ আর্মস।'

'তাহলে পল অধিকারীর সঙ্গে কবে দেখা হবে?' পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে নড়েচড়ে বসে জানতে চাইলেন দাসবাবু।

৬২

বিশেষ কারণেই 'শকুন্তলা'র শুটিং পিছিয়ে দিয়েছে সুরেশ কুমারের টিম। চিত্রনাট্যে বাৎস্যায়নের কামসূত্রের নিদান মেনে যৌনমিলনের কয়েকটি আসন রাখা হচ্ছে। এর জন্য যে বিশেষ দেহভঙ্গিমার প্রয়োজন, মনামিকে তা অভ্যাস করতে হবে। ফলে তাকে শরীরের নমনীয়তা বাড়াতে হচ্ছে বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে। সুষমা আর মুনমুন অবশ্য এ নিয়ে বেশ হাসিঠাট্টা করছে মনামির সঙ্গে। প্রায়ই ওরা বলছে যে, মনামি ভিডিয়োতে যোগাসনের প্রচার করতে চলেছে এবং সেটা থ্রু সেক্স। মুনমুন একটি অতি অসভ্য মেয়ে। সে ভেবে ভেবে একটা আইডিয়া বার করেছে এর মধ্যে। সে একটা ভিডিও ছাড়বে ইউটিউবে, যার বিষয় হবে 'সেক্সাসন'। এই বিষয়টা নিয়েও হাসাহাসির অভাব ঘটছে না।

মুনমুন টোপ্পো ক'দিন হল সুষমার কাছেই থাকছে। সুযোগ পেলে চলে আসছে মনামির কাছে। মনামিদের বিরাট সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট, সচ্ছলতার অজস্র চিহ্ন ছড়ানো পরিবেশ দেখে, তার মা-বাবার সঙ্গে একদিন আলাপ করে অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল যে মনামি কেন এ পথে এল? উত্তর পেয়ে আরও অবাক হয়েছিল। মিষ্টি হেসে মনামি বলেছিল, 'ভাল মেয়ে বলেই তো এসেছি।'

তবে মনামি যে স্বাধীন নয়, সেটা বুঝেছে মুনমুন। কারণ, তার পক্ষে বাইরে একা রাত কাটানো সম্ভব নয়। এটা থাকলে মনামি আরও দূরে চলে যেত এর মধ্যেই। নিজের জীবন আর জীবিকা নিয়ে মুনমুন উপলব্ধি করেছে যে, অধিকাংশ পুরুষ নিখুঁত ফিগারের তুলনায় একটু হিসেবে গোলমাল থাকা শরীর পছন্দ করে। মনামির ফিগারে সেই সামান্য ঘাটতিটা একদম ঠিকঠাক। গোটা এশিয়ার নারী বাজারে এই শরীরের দাম সবার উপরে। এর পর আছে শিক্ষা এবং রুচি। বস্তুত, মনামি যে একটি অপ্সরা, সেটা বোঝে মুনমুন। কিন্তু অপ্সরা হলেও স্বাধীন নয়।

এই মুহূর্তে অবশ্য তারা তিনজন একটা রেস্তরাঁতে বসে ছিল। সঙ্গে ছিলেন সুরেশ কুমার। তিনি খুব মন দিয়ে খাদ্যতালিকা পড়ছিলেন। শিলিগুড়িতে একটা সত্তর বর্গফুটের ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি মোবাইল রিচার্জের দোকান খুলেছেন। সেটা মুনমুন চালাচ্ছে। পরস্পরের মধ্যে মোবাইল যত কম ব্যবহার করে যোগাযোগ রাখা যায়, ততই মঙ্গল বলে এই ব্যবস্থা। সপ্তাহে দু'-তিনবার দোকানে ঢুঁ মারলেই যথেষ্ট। রেস্তরাঁতে এই মুহূর্তে জমায়েত হওয়ার কারণ অবশ্য কিঞ্চিৎ গুরুত্বপূর্ণ। সুরেশ কুমার কিছুদিন ধরেই একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা ওদের জানাতে চেয়ে আসছিলেন। আজ তাঁর অবসর হয়েছে।

খাদ্য-পানীয়র অর্ডার দিয়ে সুরেশ কুমার মনামির দিকে কিছুক্ষণ মন দিয়ে তাকিয়ে থেকে সন্দেহের সুরে বললেন, 'আর ইউ গেটিং স্লিম?'

'হয়েছি নাকি?' মনামি স্মিত হেসে পালটা প্রশ্ন করে। সুরেশ কুমার আপশোসের সুরে ব্যাখ্যা করে জানাতে থাকে যে, মনামি একটু স্লিম হয়ে যাওয়ায় তার শরীর থেকে দু'-একটা ম্যাজিক কার্ভ হাওয়া হয়ে গিয়েছে। 'ইউ নিড মোর ফিটনেস বাট নো মোর স্লিমনেস!'

এর পর কিছু লঘু আলোচনার পর ক্ষুধাবর্ধক পানীয়ে চুমুক দিয়ে সুরেশ কুমার আসল কথায় এলেন— 'আমি একটা বিশেষ মিশনের প্ল্যান করেছি।' তিনি শুরু করলেন, 'এই মিশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ তোমাদের করে দিতে হবে। ডুয়ার্সে ক্যাভেন্ডিস নামের একজন দিল্লি থেকে এসে মাসে কয়েকদিন থাকছেন। শিলিগুড়িতেই থাকছেন। এর বিষয়ে ইনফর্মেশন চাই, যেগুলো ওর কাছাকাছি না থাকলে পাওয়া যাবে না।'

সুরেশ কুমার থামলেন। খাদ্য-পানীয় চলে এসেছে। সেসব পরিবেশন সমাপ্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করলেন। তারপর একটা পকোড়ায় একটু কামড় দিয়ে ফের শুরু করলেন বক্তব্য, 'শিলিগুড়িতে একটা ভাল ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। সেখানে তাঁর এক শাগরেদ সবসময় থাকে। তোমরা ফাঁদে ফেলবে এই শাগরেদটাকে।'

'কেন?' সুষমা একটু অবাক হয়।

'ক্যাভেন্ডিসের মেয়ে নিয়ে কোনও হেডেক নেই। তোমরা বিকিনি পরে গেলেও একবারের বেশি ভাল করে তাকাবে না। কিন্তু দ্যাট শাগরেদ উইল বি ট্র্যাপড। ওকে নিয়ে

ফাঁকা ফ্ল্যাটে একটু খেলা শুরু করে দাও। পরেরটা তখন বলব।'

'আমরা নিশ্চয়ই তিনজন মিলে করব না কাজটা?' মনামি কৌতুকের সুরে বলে।

সুরেশ কুমার চিকেনের প্লেট টেনে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে পড়তে বললেন, 'ওই একটা কথা আছে না, পাঁঠা নিজের তো কীভাবে কাটবে, সে তোমার ভাবনা।'

'আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন?'

'একটু একটু।' সুষমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন তিনি, 'ক্যাভেন্ডিস যে ফ্লোরে ভাড়া নিয়েছে, তার নিচের ফ্লোরে একটা ফ্ল্যাট আমিও ভাড়া করেছি।'

মুনমুন টোপ্পো এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার সে খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আমি থাকব ওই ফ্ল্যাটে। কাজটা আমাকে করতে দাও।'

মুনমুন টোপ্পোর বলার ধরন দেখে সুরেশ কুমার খাওয়া থামিয়ে তার দিকে একটু তাকিয়ে থাকলেন।

'কিন্তু ক্যাভেন্ডিস থাকলে ওই শাগরেদের ছায়াও মাড়াবে না।' বললেন সুরেশ কুমার।

৬৩

গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকে বেরতে বেরতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। রঞ্জিত এখন একটা ছোট গাড়ি ভাড়া করে শিলং যাবে বলে এগজিট রোড দিয়ে বেরিয়ে এসে শিব মন্দিরটার সামনে অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে তার সঙ্গে আরও একজন যাবে। তার নাম মোয়াং। বস্তুত, রঞ্জিতকে একটা বিশেষ খবর নেওয়ার জন্য যেতে হবে চেরাপুঞ্জি। কিন্তু সেখানে থাকার চাইতে শিলং অনেক নিরাপদ। আসলে রঞ্জিতের মনে কয়েকটা খটকা জেগেছে। নবীন রাইকে দু'-দু'বার আক্রমণ করা হয়েছে। প্রথমটা মিস করলেও দ্বিতীয় হামলাটায় ইচ্ছে করলেই ওরা নবীন রাইকে খতম করে দিতে পারত। এই ঘটনার একটাই ব্যাখ্যা হয়। ওরা সাবধান করে দিতে চাইছে। কিন্তু খটকাটা সেই কারণে নয়। ওরা দ্বিতীয়বার নবীন রাইকে খুঁজে পেল কীভাবে? যদি খবরটা নিজেদের ভিতর থেকে লিক হয়ে থাকে, তবে সেটা রঞ্জিতের পক্ষে অতি দুশ্চিন্তার বিষয়। এর অর্থই হল যে, দলের মূল জায়গায় গুপ্তচর হানা দিয়েছে অথবা কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

দ্বিতীয় খটকাটা বিপক্ষের কাজের ধরন নিয়ে। পর্ন ভিডিয়োর ব্যবসাটাকে টার্গেট করেছে ওরা। এই বিজনেসটার সঙ্গে ডুয়ার্সে মেয়ে পাচারের ব্যাপারটা ভাল মেলে। সুতরাং ওরা সেইদিকেও ঝুঁকবে। ডুয়ার্স এবং নর্থ-ইস্টে মেয়ে পাচারের নিউক্লিয়াসটা দিল্লি হাই-এর হাতেই আছে। কিন্তু কাজটা যে

'একটু ডিস্টেন্স রাখো।' রঞ্জিত চাপা স্বরে বলল। নীল গাড়িটা জাতীয় সড়কে উঠে ডান দিকে বাঁক নিয়ে গতি বাড়াল। খানিকটা যাওয়ার পর অপ্রত্যাশিতভাবে জাতীয় সড়ক ছেড়ে বাঁ দিক বাঁক নিয়ে উঠল অন্য একটা রাস্তায়। রঞ্জিত ভেবেছিল গাড়ি আসাম ছেড়ে বাংলার দিকেই ফিরে যাচ্ছে। পথবদলের কারণে সে একটু অবাক হয়ে বলল, 'এ রাস্তা কোথায় যাচ্ছে?'

সিংহভাগ সামলাত, সেই বিজু প্রসাদ মারা যাওয়ার পর তার হয়ে কাজ করা মেয়েগুলো গেল কোথায়? বিপক্ষ কি তাদের তুলে নিয়েছে? মেয়ে পাচারের গোটা নেটওয়ার্ক কি এখন ওরা কন্ট্রোল করতে চাইছে? কিন্তু এই কাজটা অত্যন্ত কঠিন। নিজেদের দল থেকে ইনফো না বেরলে এই কাজ বিপক্ষের করতে পারাটা প্রায় অসম্ভব!

রঞ্জিত তাই ঠিক করেছেন দলের মেঘালয়ের লোকজনদের সাহায্য নেবেন। দরকার হলে শিলং থেকেই চলে যাবেন হাফলং।

দিনটি বেশ সুন্দর। নীল ঝকঝকে আকাশে তুলোর মতো মেঘ ভাসছে। কিন্তু রঞ্জিত প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে কখনও কিছু ভাবেনি। শিলং যেতে অন্তত ঘণ্টা আড়াই লাগবে। রঞ্জিত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল মোয়াঙের আশায়। সামনে রাস্তার ওপারে গাড়ির স্ট্যান্ড। সামনেই একঝাঁক বিদেশি গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কিছু একটা আলোচনা করছিল। রঞ্জিত একবার অলস চোখে তাকাল তাদের দিকে। তখনই তার চোখে পড়ল, একটা নীল ছোট গাড়ি ধীরগতিতে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং গাড়ির নাম্বারটি তার বেশ পরিচিত। দলের কাজে কলকাতায় এ গাড়ি চড়েছে সে। লোকজন, গাড়িঘোড়ার কারণে মন্থরগতিতে গাড়িটা সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল জাতীয় সড়কের দিকে।

ঠিক তখনই মোয়াংকে আসতে দেখল রঞ্জিত। মোয়াংও দেখেছে তাকে। সে দ্রুতপায়ে রাস্তা পেরিয়ে রঞ্জিতের সামনে এসে বলল, 'গাড়ি রেডি করে এনেছি।'

'কোথায়?'

'ওই তো।' আঙুল তুলে সামনের মোড়টা দেখাল মোয়াং। রঞ্জিত মোয়াঙের কাঁধে আলতো ঠেলা দিয়ে বলল, 'জলদি! ওই নীল গাড়িটাকে ফলো করতে হবে!'

দু'জন প্রায় ছুটতে ছুটতে মোয়াঙের ঠিক করে আনা এসইউভি গাড়িতে ওঠার পর ড্রাইভার যখন স্টার্ট নিল, তখন চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে নীল গাড়িটা। ড্রাইভারকে মোয়াং অহমিয়াতে সংক্ষেপে ফলো করার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে সে বেশ দক্ষতার সঙ্গে গাড়িটা দ্রুত নিয়ে এল জাতীয় সড়কের কাছাকাছি। দেখা গেল, নীল গাড়িও তখন সবে বড় সড়কে উঠছে।

'একটু ডিস্টেন্স রাখো।' রঞ্জিত চাপা স্বরে বলল। নীল গাড়িটা জাতীয় সড়কে উঠে ডান দিকে বাঁক নিয়ে গতি বাড়াল। খানিকটা যাওয়ার পর অপ্রত্যাশিতভাবে জাতীয় সড়ক ছেড়ে বাঁ দিক বাঁক নিয়ে উঠল অন্য একটা রাস্তায়। রঞ্জিত ভেবেছিল গাড়ি আসাম ছেড়ে বাংলার দিকেই ফিরে যাচ্ছে। পথবদলের কারণে সে একটু অবাক হয়ে বলল, 'এ রাস্তা কোথায় যাচ্ছে?'

'এটা সার রানি রোড। শিলং পার করে চেরাপুঞ্জি যাওয়ার রাস্তায় উঠবে।' জবাবটা পরিষ্কার বাংলায় দিল ড্রাইভার। রঞ্জিতের ভুরু একটু কুঁচকে গেল পথের গন্তব্য জেনে। নীল গাড়িতে কে আছে, সেটা জানা জরুরি। মোয়াংকে সেটা বলতেই সে নিচু গলায় জানিয়ে দিল যে সামনেই একটা ফরেস্ট চেকপোস্ট আছে। সেখানে গাড়ি থামবেই। তখনই আরোহীদের পাত্তা লাগাতে হবে। তারপর সে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, নীল গাড়িকে চেকপোস্টের ঠিক আগে আগে টপকে যেতে।

চেকপোস্ট নজরে আসতেই রঞ্জিতদের গাড়ি গতি বাড়িয়ে নীল গাড়িকে টপকে এগিয়ে গেল। পিছনের সিটে বসা আরোহীকে পলকের জন্য দেখতে পেল রঞ্জিত। একটু বিভ্রান্ত হল সে। মিনিটকয়েক বাদে চেকপোস্টের ওপারে নীল গাড়িটাকে পুনরায় এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দিতেই সেই আরোহীকে আরও স্পষ্টভাবে একবার দেখল। না, কোনও ভুল নেই।

'গাড়ি ঘোরাও।' নির্দেশ দিল রঞ্জিত। তারপর বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলল, 'বুদ্ধ ব্যানার্জি হিয়ার! ইজ ইট পসিবল?'

নীল গাড়ি তখন হু হু করে ছুটছে। সে গাড়ির গন্তব্য চেরাপুঞ্জি। সে গাড়ির পিছনের সিটে আধশোয়া অবস্থায় বুদ্ধ ব্যানার্জি মন দিয়ে উপভোগ করছিলেন বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। তাঁর মুখে স্মিত হাসি। মনে হচ্ছিল তিনি যেন ভ্রমণ কাহিনি লিখবেন বলে বেরিয়েছেন এই প্রকৃতির রাজ্যে।

(ক্রমশ)

জলপাইগুড়িতে পণ্ডিত রবিশংকর!

সাতের দশকের শুরুতে প্রায় কিশোর বয়সে রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে চাকরি নিয়ে জলপাইগুড়ি ছেড়েছিলাম। কাঁচরাপাড়া ও বড় জাগুলিয়ার মাঝে মোহনপুর সংলগ্ন জায়গায় বিশাল এলাকা জুড়ে সংস্থার ক্যাম্পাস। নাম থেকেই অনুমেয়, এখানে নদীবিজ্ঞান নিয়ে নানা গবেষণা চলে।

রিভার রিসার্চের চাকরির সূত্রে সখ্য হয় রবি চক্রবর্তীর সঙ্গে। উনি বয়সে বড় ছিলেন, তবে সেটা বন্ধুত্বের অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। খুব গুণী মানুষ ও মনেপ্রাণে সর্বদা সুরসাগরে বিচরণ করতেন। উনি বিখ্যাত সেতারবাদক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁর আবার গুরু ছিলেন যশস্বী সেতারবাদক পণ্ডিত নিখিল ব্যানার্জি। অল্প বয়সে নিখিল ব্যানার্জির তিরোধান না হলে তিনি ভারতের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ সেতারশিল্পীদের তালিকায় থাকতেন।

ওই বয়সে উচ্চাঙ্গসংগীতের কিছুই বুঝি না। তবে সুরজ্ঞান কিছুটা ছিল। রবিদাকে গুরু বলতাম। উনি যদিও সেতারশিল্পী ছিলেন, তবুও ওঁর গলায় অনেক কঠিন সুরের হরকত শুনে মোহিত হয়েছি। প্রয়াত বন্ধু কাজলের উদ্যোগে বড় কিছু সংগীত সম্মেলনে উচ্চাঙ্গসংগীত শুনেছিলাম— সুরের বাঁধনে বাঁধা পড়লাম। তখন শুনেছি, কিছু রসিক মানুষ পণ্ডিত রবিশংকর ও বিলায়েত খাঁ সাহেবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে অহেতুক তর্ক করতেন। দু'জনেই অসম্ভব গুণী মানুষ। যা-ই হোক, বহুবার রবিদার কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে বসে তাঁর মিষ্টি হাতের সেতার শুনেছি। তানপুরা ছেড়েছি। আকাশবাণীতে প্রথম রবিশংকরকে শুনি। তারপর লং প্লেয়িং রেকর্ড শুনেছি— পরবর্তীকালে ক্যাসেট এবং সিডি শুনেছি। তখনও হলে বসে তাঁর লাইভ অনুষ্ঠান শোনা হয়নি।

মনে পড়ে, ১৯৭৭ সালে 'দেশ' পত্রিকায় সাংবাদিক শংকর পাল ভট্টাচার্য অনুলিখিত গুরুজির আত্মজীবনীমূলক লেখা 'রাগ অনুরাগ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি করে সংখ্যা পড়ি আর অধীর আগ্রহে পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকি। প্রায় দু'বছরকাল ধারাবাহিকটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। ওই লেখা আমার মতে অনেক

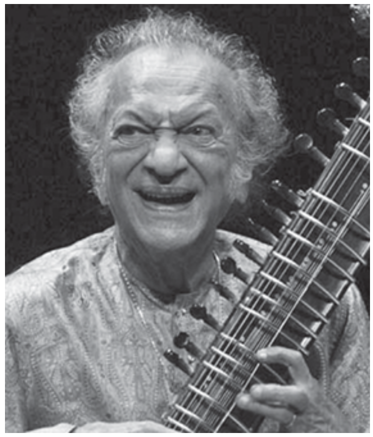

তরুণকে উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রতি আকর্ষিত করেছে।

১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একদিন শুনলাম গুরুজি জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠান করতে আসবেন। অনুষ্ঠান হবে রূপশ্রী সিনেমা হলে। প্রায় সাতশো শ্রোতার আসন ছিল। বর্তমানে ওই সিনেমা হলটি ভেঙে একটি বড় কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। জলপাইগুড়ির প্রতিটি বরিষ্ঠ নাগরিকের নানা স্মৃতি জড়িয়ে আছে সিনেমা হলটির সঙ্গে। ওই অনুষ্ঠান সমগ্র উত্তরবঙ্গে সাড়া ফেলেছিল। কোচবিহার থেকে আমার সহকর্মী-ভ্রাতা শ্রীমান অনন্য সদলে এসেছিল।

গুরুজিকে সামান্য অভ্যর্থনা জানিয়ে এবং পরিচয় পর্ব সেরে মূল অনুষ্ঠান শুরু হল। সহযোগী শিল্পীরা ছিলেন— সেতারে দীপক চৌধুরী এবং তবলায় পণ্ডিত কুমার বসু। অনবদ্য সেতারের চলন— কুমার বসুর সাহসী লয়দারি। দারুণ উপভোগ্য হল অনুষ্ঠান। সহযোগীদের প্রতি ছিল গভীর মমত্ববোধ— তাই একসময় সেতার স্তব্ধ হল— কুমার বসুর একক কৃতিত্বে শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত হলেন। তবে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছি অগাধ সুরসাগরে গুরুজির অবাধ ও সাবলীল বিচরণ।

সে দিন রাতে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করার সুযোগ ছিল না। গুরুজি যথেষ্ট ক্লান্ত ছিলেন। পরদিন সকালে ক্যাটারিং ব্যবসায়ী বাপি চৌধুরীর স্কুটারে চেপে সার্কিট হাউসে এলাম। এখানে গুরুজি ও তাঁর টিম রাত্রিবাস করেছিলেন। দোতলায় উঠে দেখি, বেশ কিছু তরুণ-তরুণী ভিড় করে আছে। চায়ের পেয়ালা হাতে গুরুজির স্যুটে গেলেন শিল্পী দীপক চৌধুরী। কিছুক্ষণ পর গুরুজি দরজায় দাঁড়ালেন। সদ্যোস্নাত সৌম্যকান্তি এক দেবপুরুষ।

একজন কর্মকর্তা পিন্টু (জ্যোতিপ্রসাদ রায়)-কে দেখে আশ্বস্ত হলাম। এবার গুরুজির চরণ স্পর্শ করা সম্ভব হবে। পিন্টু শহরের একজন অতি পরিচিত সংগীত অনুরাগী এবং রাজ্যের বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সখ্য আছে। ঠিক হল, বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে পিন্টুদের কামারপাড়ার বাড়িতে গুরুজি পদার্পণ করবেন। আমরা সঙ্গে থাকব।

এদিকে সার্কিট হাউজের লবিতে ভিড় বাড়ছিল। পরিচিত এক ফোটোগ্রাফার পেলাম। তাকে অনুরোধ করলাম আমি গুরুজির কাছে পৌঁছালে ছবি তুলতে। গুরুজি এবার সত্যিই আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। সদ্যোস্নাত ঝকঝকে এক দেবপুরুষ। জলপাইগুড়ি সত্যিকারের এক সংস্কৃতিমনস্ক শহর। সামনেই প্রবাদপ্রতিম গুরুজি, কিন্তু কোনও ঠেলাঠেলি নেই, কোলাহল নেই। সবাইকে আশীর্বাদ করলেন তিনি। বলেছিলেন, 'সংগীত সাধনার বস্তু। কঠিন পরিশ্রমের ফল অবশ্যই পাওয়া যায়।'

একটু পরে পিন্টুদের বাড়ির পথে গুরুজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলাম। এবার অন্য এক আলোকচিত্রশিল্পী ফোটো তুলেছিল। সেই ছবি আমার কাছে বহুদিন ছিল। পরে এক প্রবল বর্ষার সন্ধ্যায় আমার ব্রিফকেসে জল ঢুকে ছবি দু'টি নষ্ট হয়। সে দুঃখ আজও ভুলিনি। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, প্রথমে আমার পরিচিত যে ফোটোগ্রাফার ছবি তুলেছিলেন, তাঁর নাকি ফিল্ম খারাপ ছিল, তাই ছবিই ওঠেনি।

বিমান ধরার তাড়া ছিল, কাজেই সামান্য সময় গুরুজি ওই বাড়িতে অতিবাহিত করেন। বাড়িটির এখন ভগ্নদশা, তবে পথ চলতে কখনও ওই বাড়ির সামনে এলে ওই দেবদূতের মতো অবয়বধারী গুরুজির কথা অবশ্যই মনে পড়ে। কখনও পিন্টুর সঙ্গে আলাপচারিতায় সে দিনের কথা ফিরে ফিরে আসে। অত বড় মাপের একজন বিশ্ববন্দিত শিল্পী, কিন্তু তাঁর অমলিন হাসি এবং শিশুসুলভ সরলতা ভোলা যাবে না।

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

শ্রীমতী ডুয়ার্স

ওড়িশি নৃত্যে দেশ জুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছেন পম্পি পাল

পম্পিকে যত দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি। কচি কচি ছেলেমেয়েকে কী নিষ্ঠার সঙ্গে যে উনি ওড়িশি নৃত্য শেখান, তেমনি মনোযোগ দেন বড়দের প্রতিও। পম্পি পাল, জলপাইগুড়ির শান্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা শান্ত এক কন্যা, যার পঠনপাঠন শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ির সুনীতিবালা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং পরে সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলে। স্কুলের পাঠ শেষ করে উচ্চতর পাঠ নিয়েছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখান থেকে

নাচ নিয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। কিন্তু এখন মাত্র ৩১ বছর বয়সেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, এমনকি দেশের বাইরেও নানান গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে অনুষ্ঠান করে তিনি একদিকে যেমন ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য ওড়িশিকে আরও জনপ্রিয় করে তুলছেন, তেমনি নিজের সৃজনশীলতাকেও মেলে ধরতে পারছেন নতুন নতুন আঙ্গিকের মাধ্যমে।

ছোট্ট পম্পি নাচ শুরু করেছিলেন মাত্র চার বছর বয়সে। কত্থক নৃত্য। গুরু রানু ভট্টাচার্য। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁরই তত্ত্বাবধানে পম্পি নাচের প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হতে থাকেন। কথায় কথায় বলছিলেন, 'আমি যেহেতু উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছি, তাই বাবা আর দাদু চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই। কিন্তু আমার নাচের প্রতি এমনই টান ছিল যে টিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই হোক কিংবা স্টেজেই হোক, নাচ দেখলেই মগ্ন হয়ে যেতাম কোরিয়োগ্রাফির দিকটি নিয়ে। আমারও মনে হত, ইস্, আমিও যদি পারতাম।' এর বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। তখন পম্পি সপ্তম কি অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। এক দিদি ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ায় একটি সোনার মেডেল নিয়ে দেখাতে এসেছিলেন ওদের বাড়িতে। পম্পি অবাক হয়ে দেখেছিলেন। শুধু তা-ই না, এই প্রথম তিনি জানতে পেরেছিলেন যে ইচ্ছে করলে নাচ নিয়েও পড়াশোনা করা যায়। যার ভিতরে এমন প্রবল বাসনা, তাকে আটকানো মুশকিল। উচ্চমাধ্যমিকের পর তাই নাচ নিয়েই পড়াশোনা শুরু। গুরু রানু ভট্টাচার্য পাশে ছিলেন বলেই হয়ত বা জোর পেয়েছিলেন পম্পি। তাঁর পরামর্শেই কত্থক থেকে ওড়িশিতে আসা, অন্য একটি ফর্মকে নতুন করে জানা এবং শেখার ইচ্ছে। তিনিই পম্পির হাত ধরে আলাপ করিয়ে দেন ওড়িশির শিক্ষাগুরু পৌষালী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর কাছেই চলতে থাকে তালিম। প্রথম বিভাগে স্নাতকোত্তর হয়ে পুরোপুরি ডুবে যান পারফর্ম্যান্সের দিকে। একই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের পিএইচডি-র কাজ, তেমনি চলছে নিজের হাতে গড়ে তোলা 'কল্পদীপ'-এর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এগিয়ে চলা। যত্নের সঙ্গে লালন করছেন নিজের একক নৃত্য পরিবেশনার দিকটিও।

এত অল্প বয়সেই অনেক পুরস্কার হাতে উঠে এসেছে পম্পির। ২০০৭-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে আয়োজন করা প্রতিযোগিতায় ওড়িশি নৃত্যের বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পেয়েছেন 'গুরু মুরলীধর মাঝি স্মৃতি সম্মান', 'নৃত্যবিলাসিনী', 'নৃত্যমণি' পুরস্কার। ২০০৮-এ ছাত্র যুব উৎসবে ওড়িশি নৃত্যে প্রথম হন পম্পি। সর্বোপরি ২০০৯-এ পান ন্যাশনাল স্কলারশিপ। এসব ছাড়াও অনেক সম্মাননার আবেগে আপ্লুত হয়ে আছেন তিনি। অত্যন্ত বিনয়ী, মিষ্টভাষী আর সহজ-সরল এই ব্যক্তিত্ব তাঁর দৃঢ়তার জায়গায় অবিচল।

নাচের জন্য পম্পি ঘুরে বেড়িয়েছেন ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ত্রিপুরা, আসামসহ বিভিন্ন প্রদেশে। শুধু তা-ই নয়, বড় বড় মঞ্চেও নাচ দেখানোর জন্য ডাক পড়েছে তাঁর। যেমন— ইন্ডিয়ান হাউজ, ডিপার্টমেন্ট অব ইয়ুথ অ্যান্ড স্পোর্টস অডিটোরিয়াম, রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অডিটোরিয়াম ইন থিম্পু, ভুটান ইত্যাদি। এর পর রবীন্দ্রনাথের ১৫০তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভবন সেন্টার, লন্ডন, ইউকে-তে নাচ দেখানোর সুযোগ পান ২৭ মার্চ, ২০১১-এ। ওই বছরই ১৩ মার্চ পারফর্ম করেছিলেন ওড়িশি কালেকটিভ দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় বিদ্যা ভবন, ইউকে-তে আয়োজিত 'ডান্সারস' প্ল্যাটফর্ম ২০১১' অনুষ্ঠানে। 'যাত্রা' আর 'দুর্গা পুজা' প্রোজেক্টের জন্য কাজ করতে দু'-দু'বার পোল্যান্ড যেতে হয়েছিল ওঁকে। সেখানে থাকতে হয়েছিল পুরো এক মাস করে। এক মাসের কাজের মধ্যে ছিল ওয়ার্কশপে ওড়িশি নৃত্যশৈলী এবং সেমি-ক্লাসিক্যাল ডান্স সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া, সেই সঙ্গে মূল অনুষ্ঠানে পরিবেশন করার জন্য প্রোজেক্টের বিষয়বস্তু অনুযায়ী কোরিয়োগ্রাফি করে ওইসব ছাত্রছাত্রীকে দিয়ে তা উপস্থাপন করানো। ওখানে থাকতে গিয়ে দেখেছিলেন বলিউডের নাচের প্রতি তাদের আগ্রহ। জনপ্রিয় হিন্দি গানের সঙ্গে নাচতে ওরা খুব ভালবাসে। সেখানে ওড়িশি শেখাতে গিয়ে নতুন স্বাদ পেয়েছিলেন পম্পি। ২০০৮-এ 'সেবা উৎসব'-এ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠান করেন বাংলাদেশের ময়মনসিংহেও। নিজের শিক্ষায়তন 'কল্পদীপ'-এর প্রতি যে কতখানি ভালবাসা রয়েছে তা ফুটে ওঠে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের মধ্যে। একক নৃত্যের ক্ষেত্রে

‘ওড়িশি জ্যোতি’ পদবি পেয়েছেন— ঋতু সেনগুপ্ত, শিবম ঘোষ, সৌপল দাস, চন্দ্রিমা দে, সৌমিলি দে, সপ্তর্ষি সরকার এবং অভিজিৎ দাস। এঁরা ছাড়াও ‘ওড়িশিশ্রী’ পদবি পেয়েছেন— রাহুল রায়, মাম্পি পাল, মৌমিতা পাল এবং নয়ন্তিকা দাস। ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীকেও তৈরি করছেন অত্যন্ত যত্নে। কুশমন্ডিতে আয়োজিত রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পরিচালনায় ‘শিশু কিশোর উৎসব, ২০১৫’-এ ‘কল্পদীপ’-এর মুকুলেরা কেড়ে নিয়েছে প্রথম পুরস্কারটি। শিক্ষিকা হিসেবে পম্পি পালের সাফল্য এখানেই।

জলপাইগুড়ির বুকে বসেই যে ইচ্ছে থাকলে অনেক কিছু করা যায়, সেটাই দেখিয়ে দিয়েছেন পম্পি পাল। খুব চুপচাপ এই মেয়েটিকে তাঁর নিজের শহরেরও অনেকেই চেনেন না ঠিকঠাক। স্বভাবগতভাবে ঠান্ডা মেজাজের মানুষ হলেও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দৃঢ় এবং কঠোর হতেও দ্বিধা করেন না, যেখানে রয়েছে নিখুঁত পারফর্ম্যান্সের প্রশ্ন। প্রতিটি কাজেই তাঁর নিষ্ঠা, ধৈর্য আর পরিশ্রমের প্রকাশ। তাঁর আগামী দিনগুলি আরও সাফল্যমণ্ডিত হোক, ‘এখন ডুয়ার্স’-এর পক্ষ থেকে এই কামনা।

শ্বেতা সরখেল

শিশু দিবস উদ্‌যাপন কোচবিহারে

গত ১৪ নভেম্বর শিশু দিবস উপলক্ষে কোচবিহারের ছন্দযতি আবৃত্তি সংস্থার পক্ষ থেকে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। লাল-সাদার বর্ণময় এই পদযাত্রায় সংস্থার সব ছাত্রছাত্রী ছাড়াও শিশুদের মা ও অনেক অভিভাবক অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্থানীয় এমজেএন স্টেডিয়াম থেকে কোচবিহারের বিভিন্ন রাস্তা ও সাগরদিঘি ঘুরে ক্ষুদিরামমূর্তির পাদদেশে এসে এই পদযাত্রা শেষ হয়। এর পর অনুষ্ঠিত হয় একটি ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অধ্যাপক অনিরুদ্ধ বর্মন ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে অমল কাঞ্জিলাল এই দিনটি সম্পর্কে দু’-চার কথা বলেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কোচবিহারের নৃত্যক ক্লাসিক্যাল ডান্স অ্যাকাডেমি ও সুরবাহার সংগীত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নৃত্য ও গীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে ছন্দযতির ছাত্রী সৌমি চক্রবর্তী। সংস্থার কর্ণধার চায়না চট্টোপাধ্যায় জানান, ছন্দযতির পক্ষ থেকে আমরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সারা বছর নানারকম অনুষ্ঠান করে থাকি। এই প্রথম শিশু দিবসে আমরা পদযাত্রা করলাম। এই দিনটি যেন শুধুমাত্র চকোলেট-কেকেই

শেষ হয়ে না যায়। তাদের সুস্থ সুন্দর পরিবেশে স্নেহ-যত্ন দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে সকল মানুষকে সচেতন করাই আমাদের পদযাত্রার লক্ষ্য।

নিজস্ব প্রতিনিধি

শিশু দিবস জলপাইগুড়ির হোমে

১৪ নভেম্বর শিশু দিবস। জলপাইগুড়ির কোরক হোমের পক্ষ থেকে ওই দিনটি বিশেষভাবে পালিত হয়। ওই দিন এই হোমের সমস্ত বাচ্চার জন্মদিন পালন করা হয়। এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সন্ধেবেলাটা ওরা ভরিয়ে রাখে। ‘ভারত আমার ভারতবর্ষ’— বাচ্চাদের গলায় এই গান দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিভিন্ন ভাষাভাষী ছেলেরা এখানে থাকে। সাঁওতাল, নেপালি ভাষার গানের সঙ্গে ওরা নাচ দেখাল। কেউ কেউ গান গেয়ে

নিজের আনন্দ প্রকাশ করল, আবার কেউ গান গাইতে গাইতে কেঁদেও ফেলল। অনেকে কবিতা পাঠ করল।

সব শেষে ‘হালুম’ নাটকের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হল। একটা মজার বিষয়, সমস্ত অনুষ্ঠানটি একটি ছন্দের জাদুতে বাঁধা ছিল এবং সেটা তৈরি হয়েছিল হোমের সবাই মিলে। সে দিনের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সুধাকর চক্রবর্তী, রুনা চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত, সঞ্জয় চক্রবর্তী ও আরও অনেকে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হোমের সুপার প্রণয় দে। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসছিল এইসব বাচ্চার কথা।

সীমা সান্যাল চৌধুরী

শীতের যত্ন

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান মালা দাস

শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন— শীতের আমেজটা মনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে। কিন্তু এর স্রোতে ভাসতে গিয়ে ত্বক, চুল, হাত ও পা তার ধরনটাও পাল্টে ফেলে।

কি ত্বকে টান ধরছে? রুক্ষতা দেখা দিয়েছে তাই না? চুলটাও প্রাণহীন হয়েছে ও খুসকি হয়েছে। এত ভাবতে হবে না। সমস্যার সমাধান আছে। শীতের শীতল হাওয়া সবরকম ত্বকের উপরিভাগের চারিত্রিক ধরন পাল্টে ফেলে। তাই ত্বকের যত্ন বাড়াতে হবে। শুষ্কতার প্রকোপে ত্বক হয়ে যায় প্রাণহীন। তাই এমন ধরনের ফেস ওয়াশ বা ক্লিনসার ব্যবহার করুন যা আপনার ত্বকের রুক্ষতা বা শুষ্কতাকে দূর

করতে পারে। শীতকালে ত্বকে প্রচুর পরিমাণে ময়েশ্চারাইজার দরকার হয়। সবরকম ত্বকেই ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হবে। তৈলাক্ত ত্বকেও ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হয়— বাজারে পাওয়া যায় তৈলাক্ত ত্বকের ময়েশ্চারাইজার। মুখ পরিষ্কার করে ময়েশ্চারাইজার লাগান— আর রাতে শোবার সময় নাইট ক্রিম লাগাতে ভুলবেন না। ঘরোয়া জিনিস দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে পারেন। যেমন আটা, দুধ, মধু, কমলালেবুর রস মিশিয়ে ১৫/২০ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। তারপর ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন। চুলের জন্যও শ্যাম্পু বদল করুন। খুসকি থাকলে অ্যান্টি ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। এছাড়া মাঝে মাঝে ২ চামচ ভিনিগার ১ চামচ জল মিশিয়ে স্কাল্পে লাগান ১০/১৫ মিনিট রাখুন তারপর শ্যাম্পু করে ফেলুন।

চুলের রুক্ষতা দূর করতে আপেল ঘসে তার সঙ্গে অলিভ অয়েল, ডিম মিশিয়ে লাগান, তবে স্কাল্পে লাগাবেন না। এটা কন্ডিশনারের মতো কাজ করবে। সপ্তাহে একদিন লাগান। লাগিয়ে ১০/১৫ মিনিট রাখুন— পরে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। শীতের প্রকোপে হাত ও পা রুক্ষ হয়ে যায় এবং পা ফেটে যায়। এর জন্য ম্যানিকিওর এবং পেডিকিওর করা দরকার। রোজ রাতে গরম জলে পা পরিষ্কার করে ফুট ক্রিম লাগান। মোজা পরুন। রোজ সারা শরীরে তেল লাগান— এতে ত্বক প্রাণ পাবে। বডি লোশন লাগান। যদি সম্ভব হয় বডি স্পা বা অয়েল মাসাজ করতে পারেন— এর জন্য বিশেষজ্ঞর প্রয়োজন হবে। কারণ তেলটি ও মাসাজ বিশেষ ধরনের হয়।

এ তো হল বাহ্যিক যত্ন— আপনাকে খাওয়াদাওয়াতেও আলাদা নজর দিতে হবে। শীতকালে প্রচুর শাকসবজি আর ফল আসে। কমলালেবু বেশি করে খান। কমলার খোসাটা ফেলে দেবেন না। রোদে শুকিয়ে রাখুন এবং গুড়ো করুন। এর সঙ্গে দুধ, মধু মিশিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। এতে ত্বক উজ্জ্বল হবে। শীতকালে পিঠে, পায়েস খাওয়া, নানা ধরনের উৎসবে বেড়াতে ভালই লাগে। বাইরে গেলে সানসক্রিন লাগান। শীতের উজ্জ্বল প্রকৃতি ও নানা ফুলের সম্ভার দেখে মন হয় প্রাণোচ্ছল। তাই শীতকালে আনন্দধারায় ভেসে যান।

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেলে

শুরু হল ‘শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব’

‘শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব’-এর উদ্‌বোধন হল গত ১৯ নভেম্বর ২০১৬-তে, জলপাইগুড়ির মার্চেন্ট রোডে অবস্থিত মুক্তা ভবনের দোতলায়, ‘এখন ডুয়ার্স’-এর অফিস তথা আড্ডাঘরে। ২৭ জন শ্রীমতীর জমজমাট আড্ডায়, আলাপে, আলোচনায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল আড্ডাঘর।

‘শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব’-এর সদস্য হতে গেলে

‘শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব’-এর সদস্য হতে গেলে কোনও চাঁদা নেওয়া হবে না ঠিকই, কিন্তু ‘এখন ডুয়ার্স’-এর বাৎসরিক গ্রাহক হওয়া বাধ্যতামূলক। এর পিছনে উদ্দেশ্য একটাই, পত্রিকার তরফ থেকেই যখন এই আয়োজন, তখন পত্রিকার সঙ্গে সদস্যদের ঐকান্তিক যোগাযোগ থাকবে— এটাই স্বাভাবিক। ক্লাবের কাজকর্ম ইত্যাদি ঠিক হবে সদস্যদের পরামর্শমতোই। সে দিন উপস্থিত কেউই সদস্য হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেননি।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠান

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানটিতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই ক্লাবের সঙ্গে থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সে দিন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা ইতিমধ্যেই ‘এখন ডুয়ার্স’-এর গ্রাহক। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন অন্যান্যদের সঙ্গে। তাঁদের বক্তব্য

‘শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব’-এর সদস্য হতে গেলে কোনও চাঁদা নেওয়া হবে না ঠিকই, কিন্তু ‘এখন ডুয়ার্স’-এর বাৎসরিক গ্রাহক হওয়া বাধ্যতামূলক। এর পিছনে উদ্দেশ্য একটাই, পত্রিকার তরফ থেকেই যখন এই আয়োজন, তখন পত্রিকার সঙ্গে সদস্যদের ঐকান্তিক যোগাযোগ থাকবে— এটাই স্বাভাবিক।

অনুযায়ী, ‘এখন ডুয়ার্স’ উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত খুব সুন্দর একটি পত্রিকা, যেখানে এখানকার প্রকৃতি, মানুষ— এদের কথাই প্রাধান্য পায়। শুধু তা-ই নয়, এর পৃষ্ঠা, রঙের ব্যবহার সবকিছুই আকর্ষণীয়। শ্রুতি দত্ত রায়ের গান দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয় ঠিক বিকেল সাড়ে চারটেয়। এই দিনটি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ১০০তম জন্মদিন হওয়ায় ‘শ্রীমতী ক্লাব’ উদ্‌বোধনের ক্ষেত্রে আলাদা অর্থ বহনও করেছিল বটে। ইন্দিরা গান্ধিকে নিয়ে ছোট্ট একটা রচনা লেখেন শাঁওলি দে, সেটি পাঠ করেন হিমি মিত্র রায়।

প্রথম দিনের এই অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন মীনাক্ষী ঘোষ (মালবাজার), শাঁওলি দে, মিতালী মজুমদার, সীমা সান্যাল চৌধুরী, শ্রুতি দত্ত রায়, ছন্দা রায়, কঙ্কণা নন্দী, তিথি কর, রাত্রি বিশ্বাস, রেবা সরকার, কোয়েলা গাঙ্গুলি, ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত, ঋতুপর্ণা দত্ত, সাথী মিত্র মজুমদার, মিঠু চ্যাটার্জি গুহ, রুমা সেন, সর্বাণী গুহ, নীলাঞ্জনা সিনহা, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, অপর্ণা সরকার, শর্মিতা দত্ত (এঁরা সকলেই জলপাইগুড়ির), হিমি মিত্র রায় (মেখলিগঞ্জ), নীলাঞ্জনা সরকার (কোচবিহার)। আর ছিলেন ‘এখন ডুয়ার্স’-এর পক্ষ থেকে শ্বেতা সরখেল এবং তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। সকলের মতামত অনুযায়ী পরের মিলিত হওয়ার দিন ঠিক হয়েছে ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৬। এই দিন মজার খেলায় ছোটবেলাকে ছুঁয়ে যাবেন শ্রীমতীরা এমনটাই ভাবা হয়েছে। আড্ডা তো রয়েছেই, সে দিনই চলবে সদস্য গ্রহণের প্রক্রিয়াও। সবকিছু মিলিয়ে মজায়, হাসিতে, ঠাট্টায় মেতে উঠবেন শ্রীমতীরা। এমনই একটি ‘মুক্ত পরিবেশ’ চেয়েছিলেন সকলে। সীমা সান্যালের একটি গান দিয়ে সে দিনকার অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। এর পরও চা-বিস্কুট সহযোগে আড্ডা চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। সকলেই আনন্দে উদ্‌বেল।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভাবনা বাগান

বিবাহই মেয়েদের একমাত্র গন্তব্য নয়

এই তো মাস তিনেক আগেকার ঘটনা। একজন নাবালিকা স্বয়ং বিডিও-র কাছে গিয়ে তার পরিবারের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছে। গ্রামাঞ্চলের এই সাধারণ মেয়েটি তার পরিবারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে যে, সে আরও বেশি দূর পড়াশোনা করতে চায়, কিন্তু তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর পর মেয়েটির আত্মীয়দের ডেকে এনে বোঝানো হয় যে, মানুষ হিসেবে একটি মেয়ের স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তাই মেয়েটির ইচ্ছের স্বাধীনতাকে মূল্য দিয়ে পরিবারের উচিত বিয়ে না দিয়ে তার দাবি সমর্থন করা। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে ডিগ্রি কোর্স পড়তে আসা কিছু ছাত্রীর উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, তারা অনেকেই তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও স্বনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সচেতন। আবার অন্য একটি সার্ভে রিপোর্ট এমন কথাও বলছে যে, সমাজের সমস্ত স্তরে মেয়েরা এখনও স্বচ্ছ ও মুক্ত চিন্তাধারার দ্বারা চালিত নয়। তবে এটা অত্যন্ত সত্য, একটি রাষ্ট্র বা দেশকে প্রকৃত উন্নতিশীল বলা যাবে তখনই, যখন দেখা যাবে, বেশি সংখ্যক মেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে যে কোনও পেশাতেই নিযুক্ত হতে পারে। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মেয়েরা যেমন অংশ নিচ্ছে, তেমনি গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পর ডিগ্রি কোর্সেও পড়তে চাইছে। শুধু তা-ই না, এই যে নাবালিকারা পরিবার থেকে চাপিয়ে দেওয়া বিয়েতে অসম্মতি জানিয়ে পড়াশোনা করতে চাইছে— এটি সামাজিকভাবে অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা।

জনপ্রিয় কোনও এক দৈনিক পত্রিকার হেডলাইন ছিল— ‘বিবাহের দাবিতে টাওয়ারের চূড়ায়’। মেয়েটিকে তার সঙ্গী অর্থাৎ প্রেমিক বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিল না। তাই মেয়েটি জেদ ধরেছিল যে, সে টাওয়ারের চূড়া থেকে নামবে না, যতক্ষণ না ছেলেটি বিয়েতে মত দেয়। এর পর দমকলবাহিনী ও পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। মেয়েটিকে বলা হয় যে, ছেলেটিকে খুঁজে বার করে এনে তার দাবি মানতে অনুরোধ করা হবে— এই শর্তে মেয়েটিকে টাওয়ারের চূড়া থেকে নেমে আসতে বলা হয়। মনস্তত্ত্ববিদরা এই ঘটনায় মেয়েটির আচরণকে বিশ্লেষণ করে এ কথাই বলেন যে, মেয়েটির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি। সামান্য একটা বিয়ের লক্ষ্যে সে জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে। যার বিয়েতে মত নেই, তার উপর জোর খাটাচ্ছে। স্বচ্ছ চিন্তাধারার দ্বারা চালিত নয়। এইসব মেয়ে সম্পর্ক তৈরি হলেই বিয়ের কথা ভাবে। নারী-পুরুষের এইসব সম্পর্ক যে বিয়েতে পরিণতি পাবেই এমন কোনও শর্ত না থাকাই ভাল।

যখন এমন শোনা যায় যে, আরব দেশের মেয়েরা মিলে একটা ইউনিভার্সিটি তৈরি করে ফেলেছে, যেখানে শুধুই মেয়েরা পড়বে, আলোচনা করবে, সেমিনার করবে, মেয়েরাই পড়াবে অর্থাৎ যাবতীয় কাজ মেয়েরাই করবে, তখন মনে হয়, এরা প্রকৃতই (টাওয়ারের) চূড়ায় ওঠার যোগ্য। এমনকি আরব দেশের মেয়েরা একটা শহর বানিয়ে ফেলেছে, যেখানে কোনও পুরুষের উপর নির্ভরশীল না হয়ে শুধু মেয়েরা কাজ করবে, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। প্রত্যেকটি মেয়ের মধ্যেই চিন্তাভাবনার স্তরে এই পরিবর্তন আসা জরুরি। কোনও মেয়ের পক্ষেই এখন বিয়েটা একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-9 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

কোচবিহার রাসমেলায় সবাইকে স্বাগতম

জজ লেপচা
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
কোচবিহার ২নং পঞ্চায়েত সমিতি, পুন্ডিবাড়ি

শ্রীমতী শিখা দাস
সভাপতি
নূর ইসলাম
সহকারী সভাপতি
কোচবিহার ২নং পঞ্চায়েত সমিতি, পুন্ডিবাড়ি

কোচবিহার ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.